যাইতে—স্থান কোথায় আছে? মা, বাপ, বন্ধুবর্গ এই দারুণ দুঃসময়ে সকলি ত মরিয়াছে। কার ঘরে স্থান আছে, কোথায় যাইবার পথ আছে, কোথায় লইয়া যাইবে? আমি তোমার গলগ্রহ। আমি মরিলাম ভালই করিলাম। আমায় আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি সেই—সেই আলোকময় লোকে গিয়া আবার তোমার দেখা পাই।' এই বলিয়া কল্যাণী আবার স্বামীর পদরেণু গ্রহণ করিয়া মাথায় দিলেন। মহেন্দ্র কোন উত্তর না করিতে পারিয়া আবার কাঁদিতে লাগিলেন। কল্যাণী আবার বলিলেন,—অতি মৃদু, অতি মধুর, অতি স্নেহময় কণ্ঠ—আবার বলিলেন, 'দেখ, দেবতার ইচ্ছা কার সাধ্য লঙ্ঘন করে। আমায় দেবতায় যাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি মনে করিলে কি থাকিতে পারি—আপনি না মরিতাম ত অবশ্য আর কেহ মরিত। আমি মরিয়া ভালই করিলাম। তুমি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছ, কায়মনোবাক্যে তাহা সিদ্ধ কর, পুণ্য হইবে। আমার তাহাতে স্বর্গলাভ হইবে। দুইজনে একত্র অনন্ত স্বর্গ ভোগ করিব।'

"এদিকে বালিকাটি একবার দুধ তুলিয়া সামলাইল—তাহার পেটে বিষ যে অল্প পরিমাণে গিয়াছিল, তাহা মারাত্মক নহে। কিন্তু সে সময়ে সে দিকে মহেন্দ্রের মন ছিল না। তিনি কন্যাকে কল্যাণীর কোলে দিয়া উভয়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া অবিরত কাঁদিতে লাগিলেন। তখন যেন অরণ্যমধ্য হইতে মৃদু অথচ মেঘগম্ভীর শব্দ শুনা গেল।

'হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।'

কল্যাণীর তখন বিষ ধরিয়া আসিতেছিল, চেতনা কিছু অপহৃত হইতেছিল, তিনি মোহভরে শুনিলেন, যেন সেই বৈকুণ্ঠে শ্রুত অপূর্ব্ব বংশীধ্বনিতে বাজিতেছে :—

'হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।'

"তখন কল্যাণী অপ্সরোবিনিন্দিত কণ্ঠে মোহভরে বলিতে লাগিলেন,

'হরে মুরারে মধুকৈটভারে।'

মহেন্দ্রকে বলিলেন বল,

'হরে মুরারে মধুকৈটভারে।'

*   *   *   *

কল্যাণীর কণ্ঠ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল; তবু ডাকিতেছেন,—

'হরে মুরারে মধুকৈটভারে।'

"তখন ক্রমে ক্রমে কণ্ঠ নিস্তব্ধ হইল, কল্যাণীর মুখে আর শব্দ নাই, চক্ষু নিমীলিত হইল, অঙ্গ শীতল হইল, মহেন্দ্র বুঝিলেন যে, কল্যাণী 'হরে মুরারে' ডাকিতে ডাকিতে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছেন।" *

আমাদের কবি যখনই যেখানে সাধ্বী স্ত্রী আঁকিয়াছেন, সেই স্ত্রীর পতিপ্রেমে

* আমরা পরিচ্ছেদের প্রায় সমস্ত অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছি। ইহার কতক বর্ণনাচাতুর্য্য দেখাইবার সময়ে উদ্ধৃত করিতে হইত—কতক অন্য প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিতে হইত, সেই জন্য এই স্থলেই সকল উদ্ধৃত করিয়া লইলাম। আমাদিগের এই সমালোচনা গ্রন্থ নিকটে না রাখিয়া যাহাতে পাঠ্য হইতে পারে, আমরা তজ্জন্য পূর্ব্বাবধি চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি—অধিক পরিমাণে উদ্ধৃত করার ইহাও কারণ।

একটু ভক্তি মিশাইয়া তাহাকে আমাদিগের এতদ্দেশীয় করিয়া দেখাইয়াছেন। এই ভক্তিমিশ্রণেই তাঁহার রমণীচরিত্র এত সুন্দর ফুটিয়াছে।

যাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, তাহাতে কল্যাণীর প্রগাঢ় পতিপ্রেমের সহিত তাহার অচলা পতিভক্তি মিশিয়া কেমন উজ্জ্বল আভা বিকাশ করিতেছে—পাঠকবর্গ একবার চাহিয়া দেখুন।

এই কল্যাণীর সহিত শান্তির একটা সম্বন্ধ আছে। শান্তি ও কল্যাণী উভয়েই প্রকৃত সহধর্ম্মিণী ভাব দেখাইতেছেন—উভয়েই স্বামীর ব্রতপালনে সহায়তা করিয়াছেন—কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে। শান্তি স্বামীর ব্রত-পালনে সহায়তা করিয়াছেন, জীবানন্দের কাছে থাকিয়া—কল্যাণী স্বামীর ব্রতপালনে সহায়তা করিতেছেন, স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া। শান্তি করিয়াছেন স্বামি-প্রতিষ্ঠা—কল্যাণী করিয়াছেন স্বামি-বিসর্জ্জন।

৩। ৪। জীবানন্দ—মহেন্দ্র।

এই চরিত্র দুইটী বড় পরিষ্কার—ইহাতে বেশী বলিবার কিছুই নাই। তবে একটী মাত্র কথা আমরা বলিব।

জীবানন্দ ও মহেন্দ্র উভয়েই উৎকৃষ্ট সহধর্ম্মিণীর স্বামী। শান্তি ও কল্যাণী উভয়েই যেরূপ রূপবতী তেমনই পতি-পরায়ণা। একদিন এই স্ত্রীর জন্য উভয়েই কর্ত্তব্যধর্ম্ম বিস্মৃত হইতেছিলেন। জীবানন্দ একদিন নিমাইর বাড়ীতে শান্তিকে দেখিয়া সন্তানধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিবার কথা বলিয়াছিলেন—মহেন্দ্র একদিন এই স্ত্রী ত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া সন্তানধর্ম্ম গ্রহণে অন্যথা প্রস্তুত হইয়াও বলিয়াছিলেন—'আমি এ ব্রত গ্রহণ করিব না।' উভয়েই এই সহধর্ম্মিণী কর্ত্তৃক ধর্ম্মপালনে প্রোৎসাহিত—উভয়েই সন্তানশ্রেষ্ঠ।

তবু মহেন্দ্র ও জীবানন্দে প্রভেদ বিস্তর। জীবানন্দচরিত্রে যত ঘাতপ্রতিঘাত দেখিয়াছি—মহেন্দ্রচরিত্রে সেরূপ ঘাতপ্রতিঘাত দেখি নাই। যতদিন জীবানন্দ শান্তিকে নিমাইর বাড়ী রাখিয়া আসিয়া স্বীয় সন্তানধর্ম্ম পালন করিতেছিলেন, ততদিন তাঁহার চিত্তে বোধ হয় সময়ে সময়ে ঘাতপ্রতিঘাত হইত। শান্তির ন্যায় পত্নীকে বিনা কারণে পরিত্যাগ করিয়া পাপাচরণ করিয়াছেন বলিয়া জীবানন্দকে সময়ে সময়ে অবশ্যই ইতস্ততঃ করিতে হইত। তার পরে শান্তিকে সঙ্গে রাখিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করাই কি বড় সহজ কথা। একদিন জীবানন্দের একটু ধৈর্য্যস্খলন দেখিয়াছি বলিয়াই, তাহাকে সামান্য মানব মনে করা যায় না—জীবানন্দ চরিত্রবীর!

মহেন্দ্রের চরিত্রে এমন ঘাতপ্রতিঘাত নাই। মহেন্দ্র কল্যাণীকে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই—যদিও একবার সে সঙ্কল্প করিয়াছিল, তবু যেমন দেখিয়াছি, বোধ হয় কল্যাণীকে মৃত মনে না করিলে, সে, সে সঙ্কল্প স্থির রাখিতে পারিত না। তার পরে মহেন্দ্র যতদিন সন্তানধর্ম্ম পালন করিয়াছে—কল্যাণীকে মৃত বলিয়া জানিয়াই করিয়াছে। কল্যাণীবিরহ তাহাকে বরং ধর্ম্মপালনে প্রোৎসাহিতই করিয়াছে। সুতরাং মহেন্দ্রচরিত্র নির্দ্দোষ হইলেও, তাহাকে জীবানন্দচরিত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-

চরিত্র বলা যায় না। তবে মহেন্দ্রকে ভাগ্যবান্ সংসারী, জীবানন্দকে ভাগ্যবান্ সন্ন্যাসী বলিতে পারা যায়।

৩। নিমাই।

কপালকুণ্ডলায় যেমন শ্যামাসুন্দরী দুই এক দিনের দুই একটী কথাতেই আমাদিগের মানসক্ষেত্রে উজ্জ্বল বর্ণে বিরাজিত রহিয়াছেন—এই আনন্দমঠে নিমাইমণিও সেই রূপই দুই এক দিনের দুই এক কথাতেই আমাদিগের স্মৃতিপটে অতি সুন্দররূপে অঙ্কিত রহিয়াছেন।

নিমাইর একদিনকার ব্যবহার বা পরিচয় এইরূপ ঃ—

জীবানন্দ কল্যাণীর কন্যা সুকুমারীকে লইয়া নিমাইর বাড়ীতে গেলেন। নিমাইর বাড়ীতে একটা চরকা ছিল—জীবানন্দ সেই চরকায় শব্দ করিতে লাগিলেন। চরকার শব্দ শুনিয়া সুকুমারী বড় কাঁদিয়া উঠিল। তখন নিমাইমণি ঘর হইতে বাহির হইল, বাহির হইয়াই—"দক্ষিণ গণ্ডে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সন্নিবিষ্ট করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইল। বলিল 'এ কি এ? দাদা চরকা কাটো কেন? মেয়ে কোথা পেলে? দাদা তোমার মেয়ে হয়েছে না কি—আবার বিয়ে করেছ না কি?

পরে জীবানন্দ যখন মেয়েটিকে নিমাইমণির নিকট দুধ খাওয়াইতে দিলেন—

"নিমি তখন আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া মেয়েকে কোলে শোয়াইয়া ঝিনুক লইয়া তাহাকে দুধ খাওয়াইতে বসিল। সহসা তাহার চক্ষু হইতে ফোটাকতক জল পড়িল। তাহার একটী ছেলে হইয়া মরিয়া গিয়াছিল, তাহারই ঐ ঝিনুক ছিল। নিমি তখনই হাত দিয়া জল মুছিয়া হাসিতে হাসিতে জীবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিল,—

'হাঁ দাদা কার মেয়ে দাদা?'

জীবানন্দ বলিলেন, 'তোর কিরে পোড়ারমুখী?'

নিমি বলিল, 'আমায় মেয়েটী দেবে?'

জীবানন্দ বলিল, 'তুই মেয়ে নিয়ে কি করবি।'

নিমি। 'আমি মেয়েটিকে দুধ খাওয়াব, কোলে করিব, মানুষ করিব—"বলতে বলতে ছাই পোড়া চক্ষের জল আবার আসে, আবার নিমি হাত দিয়া মুছে আবার হাসে।"

জীবানন্দ বলিল, 'তুই নিয়ে কি করবি? তোর কত ছেলে মেয়ে হবে।'

নিমি। তা হয় হবে, এখন এ মেয়েটী দাও, এর পর না হয় নিয়ে যেও।

জীবা। তা নে, নিয়ে মরগে যা। আমি এসে মধ্যে মধ্যে দেখে যাব। উটী কায়েতের মেয়ে, আমি চল্লুম এখন—

নিমি। সে কি দাদা, খাবে না? বেলা হয়েছে যে। আমার মাথা খাও, দুটী খেয়ে যাও।

জীবা। তোর মাথাও খাব, আবার দুটী খাব? দুই ত পেরে উঠবো না দিদি। মাথা রেখে দুটী ভাত দে।

"নিমি তখন মেয়ে কোলে করিয়া ভাত বাড়িতে ব্যতিব্যস্ত হইল।

"নিমি পিঁড়ি পাতিয়া জলছড়া দিয়া জায়গা মুছিয়া মল্লিকাফুলের মত পরিষ্কার অন্ন, কাঁচা কলায়ের দাল, জঙ্গুলে ডুমুরের

দাল্‌না, পুকুরের রুইমাছের ঝোল এবং দুগ্ধ আনিয়া জীবানন্দকে খাইতে দিল। খাইতে বসিয়া জীবানন্দ বলিলেন,

'নিমাই দিদি, কে বলে মন্বন্তর? তোদের গাঁয়ে বুঝি মন্বন্তর আসে নি?'

"নিমি বলিল, 'মন্বন্তর আসবে না কেন, বড় মন্বন্তর, তা আমরা দুটী মানুষ, ঘরে যা আছে, লোককে দিই থুই ও আপনারা খাই। আমাদের গাঁয়ে বৃষ্টি হইয়াছিল, মনে নাই?—তুমি যে সেই বলিয়া গেলে, বনে বৃষ্টি হয়। তা আমাদের গাঁয়ে কিছু কিছু ধান হয়েছিল—আর সবাই সহরে বেচে এলো—আমরা বেচি নাই।'

জীবানন্দ বলিল, 'বোনাই কোথা?'

"নিমি ঘাড় হেঁট করিয়া চুপি চুপি বলিল, 'সেই দুই তিন সের চাল লইয়া কোথায় বেরিয়েছেন। কে নাকি চাল চেয়েছে?'"

"এখন জীবানন্দের অদৃষ্টে এরূপ আহার অনেক কাল হয় নাই। জীবানন্দ আর বৃথা বাক্যব্যয়ে সময় নষ্ট না করিয়া গপ্‌ গপ্‌ টপ্‌ টপ্‌ সপ্‌ সপ্‌ প্রভৃতি নানাবিধ শব্দ করিয়া অতি অল্পকালমধ্যে অন্নব্যঞ্জনাদি শেষ করিলেন। এখন শ্রীমতী নিমাইমণি শুধু আপনার ও স্বামীর জন্য রাঁধিয়াছিলেন, আপনার ভাতগুলি দাদাকে দিয়াছিলেন, পাথর শূন্য দেখিয়া অপ্রতিভ হইয়া স্বামীর অন্নব্যঞ্জন গুলি আনিয়া ঢালিয়া দিলেন। জীবানন্দ ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সে সকলগুলিই উদরনামক বৃহৎ গর্ত্তে প্রেরণ করিলেন। তখন নিমাইমণি বলিল, 'দাদা আর কিছু খাবে?'

জীবানন্দ বলিল, 'আর কি আছে?'

"নিমাইমণি বলিল, 'একটা পাকা কাঁটাল আছে।'

"নিমাই সে পাকা কাঁটাল আনিয়া দিল—বিশেষ কোন আপত্তি না করিয়া জীবানন্দ গোস্বামী কাঁটালটীকেও সেই ধ্বংসপুরে পাঠাইলেন। তখন নিমাই হাসিয়া বলিল,

'দাদা আর কিছু নাই।'

দাদা বলিলেন, 'তবে যা। আর এক দিন আসিয়া খাইব।'

"অগত্যা নিমাই জীবানন্দকে আঁচাইবার জল দিল। জল দিতে দিতে নিমাই বলিল, 'দাদা, আমার একটী কথা রাখিবে?'

জীব। কি?

নিমি। আমার মাথা খাও।

জীব। কি বল্‌না পোড়ারমুখী।

নিমি। কথা রাখ্‌বে?

জীব। কি আগে বল্‌ না।

নিমি। আমার মাথা খাও পায়ে পড়ি।

জীব। তোর মাথাও খাই—তুই পায়েও পড়, কিন্তু কি বল?

"নিমাই তখন এক হাতে আর এক হাতের আঙ্গুলগুলি টিপিয়া, ঘাড় হেঁট করিয়া, সেইগুলি নিরীক্ষণ করিয়া, একবার জীবানন্দের মুখপানে চাহিয়া একবার মাটীপানে চাহিয়া, শেষ মুখ ফুটিয়া বলিল, 'একবার বউকে ডাক্‌বো?'

"জীবানন্দ আঁচাইবার গাড়ু তুলিয়া নিমির মাথায় মারিতে উদ্যত; বলিলেন, 'আমার মেয়ে ফিরিয়ে দে, আর আমি একদিন তোর চাল দাল ফিরিয়া

দিয়া যাইব। তুই বাঁদরী, তুই পোড়ারমুখী, তুই যা না বলবার তাই আমাকে বলিস্।'

নিমাই বলিল, 'তা হউক, আমি বাঁদরী, আমি পোড়ারমুখী একবার বৌকে ডাকবো ?'

জীবা। 'আমি চল্লুম।' "এই বলিয়া জীবানন্দ হন্‌হন্ করিয়া বাহির হইয়া যায়,—নিমাই গিয়া দ্বারে দাঁড়াইল, দ্বারের কপাট রুদ্ধ করিয়া দ্বারে পিঠ দিয়া বলিল, 'আগে আমায় মেরে ফেল, তবে তুমি যাও। বৌয়ের সঙ্গে না দেখা করে তুমি যেতে পারবে না।"

"জীবানন্দ বলিল, 'আমি কত লোক মারিয়া ফেলিয়াছি তা তুই জানিস্ ?"

"এইবার নিমি রাগ করিল, বলিল, 'বড় কীর্ত্তিই করেছ, স্ত্রীত্যাগ করবে, লোক মারবে, আমি তোমায় ভয় করবো। তুমিও যে বাপের সন্তান, আমিও সেই বাপের সন্তান—লোক মারা যদি বড়াইয়ের কথা হয়, আমায় মেরে বড়াই কর।'

"জীবানন্দ হাসিল, 'ডেকে নিয়ে আয়—কোন পাপিষ্ঠাকে ডেকে নিয়ে আস্‌বি নিয়ে আয়, কিন্তু দেখ ফের যদি এমন কথা বলবি, তোকে কিছু বলি না বলি, সেই শালার ভাই শালাকে মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢেলে উল্টা গাধায় চড়িয়ে দেশের বার করে দিব।'

"নিমি মনে মনে বলিল, 'আমিও তা হলে বাঁচি।' এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে নিমি বাহির হইয়া গেল, নিকটবর্ত্তী এক পর্ণকুটীরে গিয়া প্রবেশ করিল। কুটীরমধ্যে শতগ্রন্থিযুক্ত বসনপরিধানা রুক্ষকেশা এক স্ত্রীলোক বসিয়া চরকা কাটিতে ছিল। নিমাই গিয়া বলিল, 'বৌ শিগ্‌গির শিগ্‌গির।' বৌ বলিল, 'শিগ্‌গির কি লো। ঠাকুরজামাই তোকে মেরেছে না কি, ঘায়ে তেল মাখিয়ে দিতে হবে ?'

নিমি। কাছাকাছি বটে, তেল আছে ঘরে ?

"সে স্ত্রীলোক তৈলের ভাণ্ড বাহির করিয়া দিল। নিমাই ভাণ্ড হইতে তাড়াতাড়ি অঞ্জলি অঞ্জলি তৈল লইয়া সেই স্ত্রীলোকের মাথায় মাখাইয়া দিল। তাড়াতাড়ি একটা চলনসই খোঁপা বাঁধিয়া দিল। তার পর তাহাকে এক কীল মারিয়া বলিল, 'তোর সেই ঢাকাই কোথা আছে বল।' সে স্ত্রীলোক কিছু বিস্মিতা হইয়া বলিল, 'কি লো তুই কি খেপেছিস্ নাকি ?'

"নিমাই দুম্ করিয়া তাহার পিঠে এক কীল মারিল, বলিল, 'শাড়ী বের কর।'

"রঙ্গ দেখিবার জন্য সে স্ত্রীলোক শাড়ীখানি বাহির করিল।

* * *

বলিল, কি লো নিমি, কি হইবে ?' নিমাই বলিল, 'তুই পরবি ?' সে বলিল, 'আমি পরিলে কি হইবে ? তখন নিমাই তাহার কমনীয় কণ্ঠে আপনার কমনীয় বাহু বেষ্টন করিয়া বলিল, 'দাদা এসেছে, তোকে যেতে বলেছে।' সে বলিল, 'আমায় যেতে বলেছেন ! তা ঢাকাই শাড়ী কেন, চল না এমনি যাই।' নিমাই তার গালে এক চড় মারিল—সে নিমাইয়ের কাঁধে হাত দিয়া তাহাকে কুটীরের বাহির করিল। বলিল, 'চল্ এই কাপড়

পরিয়া তাহাকে দেখিয়া আসি।' কিছু-তেই কাপড় বদলাইল না, অগত্যা নিমাই রাজি হইল। নিমাই তাহাকে সঙ্গে লইয়া আপনার বাড়ীর দ্বার পর্য্যন্ত গেল, গিয়া তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া আপনি দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল।"

আর এক দিন দেখ:—

"জীবানন্দ চলিয়া গেলে পর শান্তি নিমাইয়ের দাওয়ার উপর গিয়া বসিল। নিমাই মেয়ে কোলে করিয়া তাহার নিকটে আসিয়া বসিল। শান্তির চোখে আর জল নাই; শান্তি চোখ মুছিয়াছে, মুখ প্রফুল্ল করিয়াছে, একটু একটু হাসি-তেছে। কিছু গম্ভীর, কিছু চিন্তাযুক্ত, অন্যমনা। নিমাই বুঝিয়া বলিল,

'তবু ত দেখা হলো।'

"শান্তি কিছুই উত্তর করিল না, চুপ করিয়া রহিল। নিমাই দেখিল শান্তি মনের কথা কিছু বলিবে না। শান্তি মনের কথা বলিতে ভাল বাসে না, তাহা নিমাই জানিত। সুতরাং নিমাই চেষ্টা করিয়া অন্য কথা পাড়িল—বলিল,

'দেখ দেখি বউ কেমন মেয়েটী।'

শান্তি বলিল,

'মেয়ে কোথা পেলি—তোর মেয়ে হলো কবে লো?'

নিমি। মরণ আর কি—তুমি যমের বাড়ী যাও—এ যে দাদার মেয়ে।

"নিমাই শান্তিকে জ্বালাইবার জন্য এ কথাটা বলে নাই। 'দাদার মেয়ে' অর্থাৎ দাদার কাছে যে মেয়েটী পাই-য়াছি। শান্তি তাহা বুঝিল না; মনে করিল, নিমাই বুঝি হুচ ফুটাইবার চেষ্টা করিতেছে। অতএব শান্তি উত্তর করিল,

'আমি মেয়ের বাপের কথা জিজ্ঞাসা করি নাই—মার কথাই জিজ্ঞাসা করি-য়াছি।'

"নিমাই উচিত শাস্তি পাইয়া অপ্র-তিভ হইয়া বলিল, 'কার মেয়ে কি জানি ভাই, দাদা কোথা থেকে কুড়িয়ে মুড়িয়ে এনেছে, তা জিজ্ঞাসা করবার তো অব-সর হলো না! তা এখন মন্বন্তরের দিন, কত লোক ছেলে পিলে পথে ঘাটে ফেলিয়া দিয়া যাইতেছে; আমাদের কাছেই কত মেয়ে ছেলে বেচিতে আনিয়াছিল—তা পরের মেয়ে ছেলে কে আবার নেয়? (আবার সেই চক্ষে সেইরূপ জল আসিল—নিমি চক্ষের জল মুছিয়া আবার বলিতে লাগিল)

'মেয়েটী দিব্য সুন্দর, নাদুস নুদুস চাঁদপানা দেখে দাদার কাছে চেয়ে নিয়েছি'

এই উদ্ধৃত অংশ ৬৭ পৃষ্ঠা হইতে; কিন্তু এই ৬৭ পৃষ্ঠাতেই একটী সজীব মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে। যাঁহারা সত্য-মূলক (Real) উপন্যাস দেখিতে ভাল বাসেন এবং বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসে সেই সত্য (Reality) কম আছে বলিয়া, যাঁহারা "স্বর্ণলতা" উপন্যাসকে বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস হইতে উৎকৃষ্ট বলিতে কুণ্ঠিত হন না, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া এই ৬৭ পাতার উপন্যাস পাঠ করুন—দেখি-বেন কি সুন্দর স্বাভাবিক চিত্র।

এই কয়েক পাতা পড়িতে পড়িতে আমাদের চক্ষের উপর যেন নিমাইর চেহারাটি শুদ্ধ প্রতিফলিত হইতেছে। আমরা যেন দেখিতেছি, গৃহস্থিত চরকার

শব্দ ও শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া ১৭।১৮ বৎসরের একটি শ্যামাঙ্গী খর্ব্বাকৃতা ঈষৎ স্থূলকায় রমণী বাহিরে আসিয়া দক্ষিণ গণ্ডে দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলি সন্নিবিষ্ট করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইল। জীবানন্দের যতক্ষণ অন্যদিকে দৃষ্টি ছিল, ততক্ষণই যেন নিমাই এই ভাবে রহিল। পরে জীবানন্দের দৃষ্টি নিমাইর দিকে পতিত হইবামাত্র যেন নিমাইমণি একশ্বাসে 'এ কি এ? দাদা চরকা কাটো কেন? মেয়ে কোথায় পেলে? দাদা তোমার মেয়ে হয়েছে না কি—আবার বিয়ে করেছ না কি'—এই কয়েকটী প্রশ্ন করিল। তারপরে যখন নিমি দুধ খাওয়াইতে বসিল, আমরা তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম—দেখিলাম, দুধ খাওয়াইতে খাওয়াইতে নিমি ফোটা কতক চক্ষের জল ফেলিল—কারণ সেই দুধ খাওয়াইতে বসিয়া তাহার সেই মৃত পুত্রকে মনে পড়িল—বিশেষ সে যে ঝিনুক লইয়া দুধ খাওয়াইতেছিল, তাহা সেই ছেলেকে দুধ খাওয়াইবার ঝিনুক। নিমি যখন হাত দিয়া চক্ষের জল মুছিয়া হাসিতে হাসিতে জীবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁ দাদা কার মেয়ে দাদা"—তখন নিমির অন্তস্তল পর্য্যন্ত যেন আমরা দেখিতে পাইলাম। গ্রন্থকার যেন নূতন বৈজ্ঞানিক আলোক (X rays) জালিলেন—নিমির হৃদয়ের লুক্কায়িত পুত্রস্নেহ—সেই স্নেহের উচ্ছ্বাস চাপিয়া রাখিবার জন্য নিমাইর সেই চেষ্টা যেন আমাদিগের চক্ষে উজ্জ্বল বর্ণে প্রভাসিত হইল। জীবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুই মেয়ে নিয়ে কি করবি!' "তখন নিমাইমণি বলিল 'আমি মেয়েটিকে দুধ খাওয়াব, কোলে করিব, মানুষ করিব'—গ্রন্থকার লিখিলেন, বল্‌তে বল্‌তে ছাই পোড়ার চক্ষের জল আবার আসে, আবার নিমি হাত দিয়া মুছে আবার হাসে।' পাঠক দেখিলে এ আলোকের ছটা! নিমাইর হৃদয়ের কপাটখানি যেন গ্রন্থকার খুলিয়া দেখাইলেন। বৃহদক্ষরে মুদ্রিত কথাগুলিতে নিমাইকে কি সুন্দর ফুটাইয়াছে, একবার বিবেচনা করিয়া দেখ—শত পাতা লিখিলেই কি কাব্য ভাল হয়?

এতক্ষণ তাহার ক্ষুদ্র নবীন হৃদয়ে নবীন পুত্রস্নেহ বা পুত্রশোক দেখিয়াছ, এক্ষণে সেই হৃদয়খানির ভ্রাতৃস্নেহ একবার দেখিয়া লও। সেই যাহা পড়িয়াছ, তাহাতেও সে স্নেহের দৃষ্টি না রহিয়াছে, এমন নহে—নিমাইমণি দাদার নিকটে যাহা বলিয়াছে, তাহাতেই তাহার হৃদয়ের ভ্রাতৃস্নেহ ফুটিয়াছে—তাহার সেই "দাদা" সম্বোধন যেন আমাদের কর্ণে এখনও ধ্বনিত হইতেছে। পরে যখন নিমাই দাদাকে খাইবার জন্য অনুরোধ করিল, বলিল 'সে কি দাদা, খাবে না! বেলা হয়েছে যে। আমার মাথা খাও, দুটী খেয়ে যাও।' আমরা যেন দেখিলাম, আমাদিগের কনিষ্ঠা সহোদরা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে ভোজনের জন্য অনুরোধ করিতেছে। পরে নিমাই যেমন করিয়া জীবানন্দকে খাওয়াইল, তাহাতে আমরাও যেন জীবানন্দের সহিত মূর্ত্তিমতী ভগিনীর ভালবাসা মিশ্রিত সেই অন্নব্যঞ্জন ভোজন করিলাম।

তারপরে দেখ—নিমাইর আর এক প্রকারের হৃদয়ের বৃত্তি। নিমাই তাহার দাদাকে বলিতেছে—'দাদা আমার একটী

কথা রাখিবে ?' জীবানন্দ যখন জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি বল'

"নিমাই তখন এক হাতে আর এক হাতের অঙ্গুলি টিপিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া, সেইগুলি নিরীক্ষণ করিয়া, একবার জীবানন্দের মুখ-পানে চাহিয়া একবার মাটী পানে চাহিল। শেষ মুখ ফুটিয়া বলিল 'একবার বউকে ডাকবো ?'

গ্রন্থকারের লেখনীসঞ্চালনে যেন বিদ্যুতের আলো জ্বলিয়া উঠে—তাহাতে যেন অতি অন্ধকারাবৃত স্থানগুলিও আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। এই নিমাইর এই ভাব যেন আমরা কোথাও দেখিয়াছি, তাহাই মনে হয়। 'দাদা একবার বউকে ডাকবো ?' এ কথা যেন আমাদেরই ভগিনী আমাদের কাছে বলিতেছে।

তার পরে সেই ক্ষুদ্র হৃদয়ের আর এক প্রকারের উচ্ছ্বাস দেখ। নিমাই নাছোড়বন্দা। তাহার ভ্রাতৃস্নেহ, তাহার ভ্রাতৃজায়ার প্রতি ভালবাসা, তাহার রমণী-সুলভ মিলনদর্শনেচ্ছা একত্র হইয়া তাহার হৃদয়ে উচ্ছ্বাস উঠাইল। সেই উচ্ছ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া নিমাই দাদার নিকট আব-দার ধরিল—বৌয়ের সঙ্গে দেখা করিতেই হইবে—দাদে পিঠ দিয়া বলিল 'আগে আমায় মেরে ফেল, তবে তুমি যাও। বৌয়ের সঙ্গে না দেখা করে তুমি যেতে পারবে না।' জীবানন্দ বলিলেন 'আমি কত লোক মারিয়া ফেলিয়াছি, তা তুই জানিস্ ?' নিমি রাগ করিয়া ইহার যে উত্তর করিল, তাহাতে তাহার রমণীর রমণীহৃদয় যেন মিশিয়া আসিল। এ সব এমন সুন্দর, এমন স্বাভাবিক যে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

তারপরে দেখ—নিমি শান্তিকে সাজ গোজ পরাইবার জন্য মহা ব্যতিব্যস্ত—দাদার কাছে বৌ যাবে—এমন বেশে কি যাওয়া যায় ? সেই বা কেমন সুন্দর, কেমন স্বাভাবিক !

আর একদিনকার নিমাইকে দেখ। সেই যে দিন নিমাই মেয়ে কোলে করিয়া শান্তির নিকটে বসিয়া তাহাকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া বলিল—'তবু ত দেখা হলো।' সেই কেমন সান্ত্বনার কথা, কেমন সহানু-ভূতির কথা। তারপরে মেয়েটী লইয়া শান্তির সহিত তাহার একটু রসালাপও হইল। পরে যখন গ্রন্থকার লিখিলেন,

"আবার সেই চক্ষে সেইরূপ জল আসিল—নিমি চক্ষের জল মুছিয়া আবার বলিতে লাগিল—'মেয়েটি দিব্য সুন্দর নাহুস্ নুহুস্ চাঁদপানা দেখে দাদার কাছে চেয়ে নিয়েছি।'"

তখন যেন আমরা দেখিলাম, নিমাই চোখে জল লইয়া মেয়েটি দুই হাতে ধরিয়া নাচাইতেছে বা পিঠ চাপড়াইতেছে আর বলিতেছে—'মেয়েটি দিব্য নাহুস্ নুহুস্'—আমরা যেন দেখিলাম নিমাই এই কথাগুলি বলিয়া সেই মেয়েটীর মুখচুম্বন করিল ও আবার চক্ষের জল মুছিল।

তারপরে যে দিন নিমাইর নিকট হইতে জীবানন্দ মেয়ে আনিতে গেলেন, সে দিনকার নিমাইর বর্ণনা একমুখে ব্যাখ্যা করা যায় না। যাঁহারা মনে করেন, গ্রন্থকার স্বাভাবিক ঘটনা সজীব করিয়া বর্ণনা করিতে সক্ষম নহেন, তাঁহারা এই লাইন কয়েক পড়িয়া সেই ভ্রম দূর করুন, এমন স্বাভাবিক ব্যাপারের

সজীব বর্ণনা অতি অল্প স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়।

"জীবানন্দ ভরুইপুরে নিমাইয়ের নিকট হইতে মেয়ে আনিতে গেলেন—কাজটা বড় সহজ বোধ হইল না।

"তখন নিমাই প্রথমে ঢোক গিলিল, একবার এদিক ওদিক চাহিল। তারপর একবার তার ঠোঁটটি নাক ফুলিল। তার পর সে কাঁদিয়া ফেলিল। তারপর বলিল 'আমি মেয়ে দিব না'

"নিমাই, গোল হাতখানির উল্টাপিঠ চোখে দিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া চক্ষু মুছিলে পর জীবানন্দ বলিলেন, 'তা দিদি কাঁদ কেন, এমন দূরও তো নয়—তাদের বাড়ী তুমি না হয় গেলে, মধ্যে মধ্যে দেখে এলে।'

"নিমাই ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, 'তা তোমাদের মেয়ে তোমরা নিয়ে যাও না কেন? আমার কি?' নিমাই এই বলিয়া সুকুমারীকে আনিয়া রাগ করিয়া দুম করিয়া জীবানন্দের কাছে ফেলিয়া দিয়া পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল। সুতরাং জীবানন্দ তখন আর কিছু না বলিয়া এদিক ওদিক বাজে কথা কহিতে লাগিলেন। কিন্তু নিমাইয়ের রাগ পড়িল না। নিমাই উঠিয়া গিয়া সুকুমারীর কাপড়ের বোচকা, অলঙ্কারের বাক্স, চুলের দড়ি, খেলার পুতুল ঝুপঝাপ করিয়া আনিয়া জীবানন্দের সম্মুখে ফেলিয়া দিতে লাগিল। সুকুমারী সে সকল আপনি গুছাইতে লাগিল। সে নিমাইকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল 'হা মা—কোথায় যাব মা?' নিমাইয়ের আর সহ্য হইল না। নিমাই তখন সুকুকে কোলে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।"

এখন দেখ, এই কয়েক পাতার বর্ণনায় কেমন বিচিত্র ভাবপূর্ণ একটী সজীব চরিত্র সৃষ্ট হইল। যদি স্বাভাবিক ব্যাপারের সজীব বর্ণনাতেই বেশী বাহাদুরী থাকে, আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি, এমন বাহাদুরী বাঙ্গালায় আর কোন পুস্তকেই নাই। সেই কপালকুণ্ডলার শ্যামাসুন্দরীও নিমাইর নিকট নিষ্প্রভ—দুই চারিটী লেখাপাতে এমন সজীব চিত্র অঙ্কন বঙ্কিম বাবুরও অন্য পুস্তকে নাই।

ভাষা—বর্ণনা—ঘটনা—ইত্যাদি।

ভাষা—বর্ণনা।

"আনন্দমঠ" উপন্যাসের বর্ণনা বড়ই মনোহারিণী। সরল ভাষায় সুমধুর বর্ণনা বঙ্কিম বাবুর অন্য গ্রন্থেও এমন আছে বলিয়া বোধ হয় না। যে ভাষা ও বিষয়-দৃষ্টি বর্ণনার প্রাণ, তাহাতে বঙ্কিম বাবু পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। দুই একটী উদাহরণ দেখাইয়া কথাটি প্রতিপন্ন করিতেছি।

প্রথমে দেখ, ১১৭৪ সালের সেই দুর্ভিক্ষবর্ণনা। আমরা স্থানান্তরে * সেই বর্ণনার কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছি। সেই বর্ণনা যেন সহস্র মুখ হইয়া সরল কথায় ১১৭৪ সালের সেই দুর্ভিক্ষটা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছে। বর্ণনার বাহাদুরী দেখ—বেশী বড় কথা নাই—বেশী অলঙ্কারেরও সমাবেশ নাই। সহজ

---

* ৩ পৃষ্ঠা দেখ।

কথায়, সরলভাবে সেই দুর্ভিক্ষের কথাটা যেন আমাদিগের প্রাণে গাঁথিয়া দিতেছে। এইরূপ আর একটী বর্ণনা তৃতীয় খণ্ডের প্রারম্ভে আছে। সেটা ৭৬ সালের বর্ণনা। অনেকে মনে করেন যে, সরল ভাষায়, বিনা শব্দাড়ম্বরে বাগ্মিতা প্রকাশ করা যায় না। তাঁহাদিগকে একবার আনন্দমঠের মহেন্দ্রসিংহের সহিত ভবানন্দের কথোপকথন পড়িতে অনুরোধ করি। ভবানন্দ বলিতেছেন,

"মহেন্দ্রসিংহ তোমাকে মানুষের মত মানুষ বলিয়া আমার কিছু বোধ ছিল, কিন্তু এখন দেখিলাম, সবাই যা তুমিও তা। কেবল দুধ ঘির যম। দেখ সাপ মাটীতে বুক দিয়া হাঁটে, তাহার অপেক্ষা নীচ জীব আমি ত আর দেখি না; সাপের ঘাড়ে পা দিলে সেও ফণা ধরিয়া উঠে। তোমার কি কিছুতেই ধৈর্য্য নষ্ট হয় না? দেখ যত দেশ আছে,—মগধ, মিথিলা, কাশী, কাঞ্চী, দিল্লী, কাশ্মীর, কোন্ দেশের এমন দুর্দ্দশা, কোন্ দেশে মানুষ খেতে না পেয়ে ঘাস খায়? কাঁটা খায়? উইমাটি খায়? বনের লতা খায়? কোন্ দেশে মানুষ শিয়াল কুকুর খায়, মড়া খায়? কোন্ দেশের মানুষের সিন্দুকে টাকা রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, সিংহাসনে শালগ্রাম রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঘরে ঝি বউ রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঝি বউয়ের পেটে ছেলে রেখে সোয়াস্তি নাই? পেট চিরে ছেলে বার করে। সকল দেশে রাজার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের সম্বন্ধ। আমাদের রাজা রক্ষা করে কই? ধর্ম্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, কুল গেল, এখন ত প্রাণপর্য্যন্তও যায়। এ নেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে?"

বাগ্মিতা আর কাহাকে বলে? কথাগুলি যেন স্তরে স্তরে উঠিয়া মহেন্দ্রসিংহের অস্থিমজ্জাগত হইয়া তাহার নির্জ্জীব ধমনীতে উৎসাহশোণিত বহাইয়া দিতেছে। এইরূপ ভাষার স্রোত আর একস্থলেও বড় সুন্দর প্রবাহিত হইয়াছে।

"তখন মঠের দ্বারে দাঁড়াইয়া তরবারি হস্তে জ্ঞানানন্দ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন 'আমরা অনেক দিন হইতে মনে করিয়াছি যে, এই বাবুইয়ের বাসা ভাঙ্গিয়া এই যবনপুরী ছারখার করিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিব। এই শূয়রের খোঁয়াড় আগুণে পোড়াইয়া মাতা বসুমতীকে আবার পবিত্র করিব। ভাই আজ সেই দিন আসিয়াছে। আমাদের গুরুর গুরু, পরম গুরু, যিনি অনন্তজ্ঞানময়, সর্ব্বদা শুদ্ধাচার, যিনি লোকহিতৈষী, যিনি সনাতন ধর্ম্মের পুনঃপ্রচারজন্য শরীরপাতনপ্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—যাঁহাকে বিষ্ণুর অবতারস্বরূপ মনে করি, যিনি আমাদের মুক্তির উপায়, তিনি আজ মুসলমানের কারাগারে বন্দী। আমাদের তরবারে কি ধার নাই?' হস্ত প্রসারণ করিয়া, জ্ঞানানন্দ বলিলেন, 'এ বাহুতে কি বল নাই?'—বক্ষে করাঘাত করিয়া বলিলেন, 'এ হৃদয়ে কি সাহস নাই?—ভাই ডাক, হরে মুরারে মধুকৈটভারে।—যিনি মধুকৈটভ বিনাশ করিয়াছেন—যিনি হিরণ্যকশিপু, কংস, দন্তবক্র, শিশুপাল প্রভৃতি দুর্জ্জয় অসুরগণের নিধন সাধন করিয়াছেন—যাঁহার চক্রের ঘর্ঘরনির্ঘোষে মৃত্যুঞ্জয় শম্ভুও ভীত হইয়াছিলেন,—নির্ভি

অজেয়, রণে জয়দাতা, আমরা তাঁর উপবাস, তাঁর বলে আমাদের বাহুতে অনন্ত বল—তিনি ইচ্ছাময়, ইচ্ছা করিলেই আমাদের রণজয় হইবে। চল আমরা সেই যবনপুরী ভাঙ্গিয়া ধূলিগুঁড়ি করি। সেই শূকরনিবাস অগ্নিসংস্কৃত করিয়া অজয়ে ফেলিয়া দিই। সেই বাবুইয়ের বাসা ভাঙ্গিয়া খড় কুটা বাতাসে উড়াইয়া দিই। বল—হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

যেখানে বর্ণনায় তিনি সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, সেখানেও তিনি সেই বর্ণনা অতি সুমধুর করিয়াছেন। আনন্দমঠের সেই স্থাপিত চতুর্ভুজ মূর্ত্তির বর্ণনা দেখ। *

ফলতঃ "আনন্দমঠ" উপন্যাসের ভাষা সর্ব্বত্রই প্রায় সরলতা ও প্রসাদগুণশালিনী।

তার পর দেখ বর্ণনার দৃষ্টি। বর্ণনায় বর্ণিতব্য বিষয় প্রতি বঙ্কিম বাবুর যেমন দৃষ্টি, সেই বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝাইতে উপমা দিবার জন্য অন্যান্য বিষয়েও তাঁহার সেইরূপই দৃষ্টি। দুইচারিটি উদাহরণ দিয়া কথাটা প্রতিপন্ন করিতেছি।

সুকুমারীর বিষ খাওয়ার ব্যাপারটা স্মরণ কর, দেখ গ্রন্থকার তাহা কেমন বর্ণনা করিয়াছেন।

"সুকুমারী মনে করিল, এটি বেশ খেলিবার জিনিস। কৌটাটি একবার বাঁ হাতে ধরিয়া দাহিন হাতে বেশ করিয়া তাহাকে চাপড়াইল, তার পর দাহিন হাতে ধরিয়া বাঁ হাতে তাহাকে চাপড়াইল। তার পর দুই হাতে ধরিয়া টানাটানি করিল। সুতরাং কৌটাটি খুলিয়া গেল—বড়িটি পড়িয়া গেল।

"বাপের কাপড়ের উপর ছোট গুলিটি পড়িয়া গেল—সুকুমারী তাহা দেখিল। মনে করিল এও আর একটা খেলিবার জিনিস। কৌটা ফেলিয়া দিয়া থাবা মারিয়া বড়িটি তুলিয়া লইল।

"কৌটাটি সুকুমারী কেন গালে দেয় নাই বলিতে পারি না—কিন্তু বড়িটি সম্বন্ধে কালবিলম্ব হইল না। প্রাপ্তি মাত্রেণ ভোক্তব্য—সুকুমারী বড়িটি মুখে পুরিল। সেই সময়ে তাহার উপর মার নজর পড়িল।"

নিমাইমণির চরিত্র দেখাইতে এরূপ অনেক বর্ণনা দেখিতে পাইবে। আরও দুই একটা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। গ্রন্থকার গৌরী ঠাকুরাণীর বর্ণনা করিতেছেন।

"স্ত্রীলোকটী অর্দ্ধবয়স্কা, মোটা সোটা কালো, ঠেঁট পরা, কপালে উল্কি, সীমন্তপ্রদেশে কেশদাম চূড়াকারে শোভা করিতেছে। ঠন ঠন্ করিয়া হাড়ির কানায় ভাতের কাটি বাজিতেছে, ফর ফর্ করিয়া অলকদামের কেশগুচ্ছ উড়িতেছে, গল্ গল্ করিয়া মাগী আপনা আপনি বকিতেছে, আর তার মুখভঙ্গীতে তাহার মাথার চূড়ার নানাপ্রকার টলুনি টালুনির বিকাশ হইতেছে।"

ইহাতে দেখিলাম—বর্ণিত বিষয় প্রতি গ্রন্থকারের সূক্ষ্মদৃষ্টি। বিষয়টি তন্ন তন্ন করিয়া না দেখিলে, এমন বর্ণনা করিতে হয় না।

তার পরে দেখ বঙ্কিম বাবুর উপমা। স্ত্রীজাতির "সৌন্দর্য্য যেমনই সংসারে

* ৬—৯ পৃষ্ঠা দেখ।

অপূর্ব্ব—সে সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবুর বর্ণনাও তেমনই কাব্যে অপূর্ব্ব।

শান্তির সেই রূপবর্ণনা মনে কর। দেখ কি সুন্দর উপমা দ্বারা কি সুন্দর বর্ণনা হইয়াছে। আরও কয়েকটি এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি।

"সে স্ত্রীলোকের বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর, কিন্তু দেখিলে নিমাইয়ের অপেক্ষা অধিক বয়স্কা বলিয়া বোধ হয় না। মলিন, গ্রন্থিযুক্ত বসন পরিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, বোধ হইল যেন গৃহ আলো হইল। বোধ হইল পাতায় ঢাকা কোন গাছের কত ফুলের কুঁড়ি ছিল, হঠাৎ ফুটিয়া উঠিল। বোধ হইল যেন কোথায় গোলাপজলের কার্ব্বা মুখ আঁটা ছিল, কে কার্ব্বা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। যেন কে প্রায় নির্ব্বাণ আগুনে ধূপ ধুনা গুগ্‌গুল ফেলিয়া দিল।"

অন্যত্র—কল্যাণী মুমূর্ষু অবস্থায় শয়ন করিয়া আছেন, সেই রূপবর্ণনা দেখ। *

অন্যত্র কল্যাণীর রূপবর্ণনা এইরূপ করিয়াছেন।

"একটী ঘরে ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া, এক অপূর্ব্ব সুন্দরী। কিন্তু সৌন্দর্য্যের উপর একটা ঘোরতর ছায়া আছে। মধ্যাহ্নে কূলপরিপ্লাবিনী প্রসন্নসলিলা বিপুলজলকল্লোলিনী স্রোতস্বতীর বক্ষের উপর অতি নিবিড় মেঘের ছায়ার ন্যায় কিসের ছায়া আছে। নদীহৃদয়ে তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইতেছে, তীরে কুসুমিত তরুকুল বায়ুভরে হেলিতেছে, ঘন পুষ্পভরে নমিতেছে, অট্টালিকাশ্রেণীও শোভিতেছে। তরণীশ্রেণীর তাড়নে জল আন্দোলিত হইতেছে। কাল মধ্যাহ্ন, তবু সেই কাদম্বিনীনিবিড় কালো ছায়ায় সকল শোভাই কালিমাময়। এও তাই। সেই পূর্ব্বের মত চারু চিক্কণ চঞ্চল নিবিড় অলকদাম, পূর্ব্বের মত সেই প্রশস্ত পরিপূর্ণ ললাটভূমে পূর্ব্বমত অতুল তুলিকালিখিত ভ্রূযুগ, পূর্ব্বের মত বিস্ফারিত সজল উজ্জ্বল কৃষ্ণতার বৃহচ্চক্ষু, তত কটাক্ষময় নয়, তত লোলতা নাই, কিছু নম্র। অধরে তেমনি রাগরঙ্গ, হৃদয় তেমনি শ্বাসানুগামী পূর্ণতায় ঢল ঢল, বাহু তেমনি বনলতাদুষ্প্রাপ্য কোমলতাযুক্ত। কিন্তু আজ সে দীপ্তি নাই, সে উজ্জ্বলতা নাই, সে প্রখরতা নাই, সে চঞ্চলতা নাই, সে রস নাই। বলিতে কি, বুঝি সে যৌবন নাই। আছে কেবল সে সৌন্দর্য্য আর সে মাধুর্য্য। নূতন হইয়াছে ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য। ইঁহাকে পূর্ব্বে দেখিলে মনে হইত, মনুষ্যলোকে অতুলনীয়া সুন্দরী, এখন দেখিলে বোধ হয়, ইনি দেবলোকে শাপগ্রস্তা দেবী।"

বঙ্কিম বাবুর যুদ্ধবর্ণনা বড়ই সুন্দর। সেই যুদ্ধে সেনাপতিগণের উৎসাহবাক্য, তাহাদিগের আত্মত্যাগের বর্ণনাগুলিও বড়ই মনোহারিণী। প্রস্তাববাহুল্যভয়ে আর উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলামনা।

তার পরে বাহিরের প্রকৃতির সহিত মানবপ্রকৃতির একতাব্যঞ্জক বর্ণনাও আনন্দমঠে অভাব নাই।

প্রথমে উপক্রমণিকা দেখ।

পরে ভবানন্দের সেই রাত্রির বর্ণনা মনে কর। *

"আনন্দমঠ" উপন্যাসে বঙ্কিম বাবুর রসভাষণেরও অভাব নাই। শান্তি কাপ্তেন

* ৫৭ পৃষ্ঠা দেখ।

* ৪১—৪২ পৃষ্ঠা দেখ।

টনাদের সহিত যেরূপ রসালাপ করিয়াছিল—বৈষ্ণবী সাজিয়া এডওয়ার্ডসের সঙ্গে যেরূপ কৌতুক করিয়াছিল, তাঁহা বলিবনা, তাহাতে ভালর সম্বন্ধে বক্তব্য বড় কিছু নাই। যেস্থলে বঙ্কিম বাবু তাহা লইয়াই কৌতুক করিয়াছেন—তাহাকেই হাস্যযুক্ত করিয়া আমাদিগকে আমোদিত করিয়াছেন, তাহারই একটা দৃষ্টান্ত দিব। এ দৃষ্টান্ত আমরা বাছিয়া দিলাম না।

"ঠাকুরুণ দিদি ভবানন্দকে দেখিয়া, শশব্যস্তে বস্ত্রাদি সামলাইতে লাগিল। মস্তকের মোহন চূড়া খুলিয়া ফেলিবেন ইচ্ছাছিল, কিন্তু সুবিধা হইল না, কেন না সকড়ি হাত। নিবেকমস্থণ সেই চিকুরজাল—হায় তাহাতে পূজার সময় একটী বকফুল পড়িয়াছিল!—বস্ত্রাঞ্চলে ঢাকিতে যত্ন করিলেন; বস্ত্রাঞ্চল, তাহা ঢাকিতে সক্ষম হইল না, কেননা ঠাকুরুণটী একখানি পাঁচ হাত কাপড় পরিয়াছিলেন। সেই পাঁচ হাত কাপড় প্রথমে গুরুভারপ্রণত উদর প্রদেশ বেষ্টন করিয়া আসিতে প্রায় নিঃশেষ হইয়া পড়িয়াছিল, তার পর দুঃসহ ভারগ্রস্ত হৃদয়মণ্ডলেরও কিছু আবরু পর্দা রক্ষা করিতে হইয়াছে। শেষে ঘাড়ে পৌঁছিয়া বস্ত্রাঞ্চল জবাব দিল। কাণের উপর উঠিয়া বলিল আর যাইতে পারি না। অগত্যা পরম ব্রীড়াবতী গৌরী ঠাকুরাণীর কথিত বস্ত্রাঞ্চলকে কাণের কাছে ধরিয়া রাখিলেন। এবং ভবিষ্যতে আট হাত কাপড় কিনিবার জন্য মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বলিলেন 'কে গোঁসাই ঠাকুর? এস এস! আমায় আবার প্রাতঃপ্রণাম কেন ভাই?'"

তার পরে অতুলনীয় সঙ্গীতটীর কথা মনে কর—সেই 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র; তাহা হইলেই জীবানন্দকে আমাদের বক্তব্য শেষ হইবে।

ঘটনা।

এই ঘটনাবর্ণনাতে বঙ্কিম বাবু অনেক স্থলে স্বাভাবিকতা পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই কথা এক দল লোকে বলিয়া থাকেন। এই কথাটি আমরা অস্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। তবে আমরা ইহাই বলিব যে, এই ঘটনাবর্ণনা তাঁহার নিকট অতি আনুষঙ্গিক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ভাবই তাঁহার বর্ণিতব্য বিষয়—তাহার প্রতি তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন—ঘটনার প্রতি তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন নাই।

যেমন দেখ, শান্তি শিক্ষা ও সংসর্গগুণে কিছু পৌরুষভাবাপন্ন হইয়াছিল। গ্রন্থকার এই ভাবটি দেখাইবার জন্য কতকগুলি ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন। তোমরা সে সকল ঘটনাকে অস্বাভাবিক এই অর্থে বলিতে পার যে, উহা প্রায়ই ঘটে না। কিন্তু তোমরা ইহা বলিতে পারিবে না যে, শান্তির মনোবৃত্তির সহিত সেই ঘটনার মিলন নাই—সেই সকল ঘটনায় শান্তির পৌরুষভাব ফুটে নাই। ভাবিয়া দেখিলে, এই যে অস্বাভাবিকতা, ইহা মূলেই অস্বাভাবিকতা নহে—ইহা যে ঘটিতেই পারে না—এমন প্রমাণ করা যায় না। তবে এরূপ ঘটিতে কোথাও দেখি নাই, এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি। এ সম্বন্ধে নানা

স্থানে অনেক কথা বলা হইয়াছে *পুনরায় আর বলিতে ইচ্ছা নাই।

ঘটনায় একটু রহস্য বা জটিলতা থাকিলেই, ভাল হয়। আনন্দমঠে এই-রূপ রহস্যপূর্ণ ঘটনার সমাবেশ যথেষ্ট আছে। দুই একটী এইরূপ ঘটনার পরিচয় দিতেছি।

১ম। উপক্রমণিকার ঘটনা। সত্যানন্দের সেই প্রশ্ন—সেই উত্তর—সবই রহস্যময়। এ ঘটনার রহস্যভেদ দেখিবার জন্য বড়ই কৌতূহল হয়। আবার ঘটনাটিও বেশ গম্ভীরতার যুক্ত—যাহাকে ইংরেজীতে Grand বলে তাহাই।

২য়। কল্যাণীর দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার ঘটনা। এটিও রহস্যপূর্ণ—তার পরে কল্যাণীর সেই পলায়নের সময়ে সেই অন্তরীক্ষের গান—সেই শুভ্রকেশ শুভ্রবসন ঋষিমূর্ত্তির আবির্ভাব যেমন বিস্ময়কর, তেমনই গাম্ভীর্য্যপূর্ণ—যেমনই Grand তেমনই Beautiful.

৩য়। আনন্দমঠের সন্তানগণের কার-বার। সেও বিস্ময়কর ব্যাপার—তাহারও রহস্য উদ্ভেদে মন স্বতঃই কৌতূহলী হয়।

৪র্থ। মহেন্দ্র ও ভবানন্দের ধৃত হও-য়ার ঘটনা—তাহাদিগের মুক্তি, সবই কৌতূহলজনক—অথচ বিস্ময়কর। বিশেষ অস্বাভাবিকও নহে।

৫ম। কল্যাণীর স্বপ্ন। বড়ই Grand গাম্ভীর্য্যভাবপূর্ণ। রহস্যময়, কিছু অমানুষ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই দেখা যায়, উহা সত্যানন্দ ঠাকু-রেরই কৌশল। সত্যানন্দ ভবানন্দের এ সম্বন্ধে কথোপকথন পড়িলে, এই রূপই সন্দেহ হয়। কিন্তু এ কথা ভাল করিয়া না বুঝিয়া সত্যানন্দকে আক্রমণ করিতে যাওয়া যায় না।

৬ষ্ঠ। মহেন্দ্রের কারামুক্তি। সে ঘটনা এত বিস্ময়কর যে, মহেন্দ্র তাহা দৈব ব্যাপার বলিয়াই বুঝিতে বাধ্য হইয়াছিল। একটু নিবিষ্টচিত্তে দেখিলেই বুঝা যায় যে, এ সব স্থলে সত্যানন্দের বুদ্ধিবলই অন্যের নিকট দৈববল বলিয়া বিবেচিত হইত।

৭ম। কল্যাণীর জীবন প্রাপ্তি। ইহাও রহস্যপূর্ণ, অথচ অস্বাভাবিকও নহে। এখনও এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা বন্য ঔষধাদি দ্বারা অন্যের অসাধ্য ব্যাপার সাধন করিয়া আমাদিগকে চমৎ-কৃত করিয়া তুলেন। ভবানন্দের সেরূপ ঔষধ জানা কিছু অমানুষ ব্যাপার নহে।

কত আর দেখাইব। আনন্দমঠ এরূপ রহস্যপূর্ণ ঘটনায় পূর্ণ হওয়াতে কাব্যাংশে সাধারণের নিকট কম সম্মান লাভ করে নাই।

ইতিবৃত্ত।

বাঙ্গালা ১২৮৮ সালে "আনন্দমঠ" প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার কতকাংশ পূর্ব্বে "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। অদ্য পর্য্যন্ত ইহার ৫টি সংস্ক-রণ হইয়াছে। এই ৫ম সংস্করণে গ্রন্থখানি বড়ই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রধান স্ত্রীচরিত্র "শান্তি" সম্বন্ধে ইহাতে অনেক কথা নূতন লিখিত হইয়াছে—ভবানন্দ-চরিত্রও বিশেষ সংশোধিত হইয়াছে। এই ৫ম সংস্করণের "আনন্দমঠ" ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণের "আনন্দমঠ" এ বিশেষ বিভিন্নতা

*বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমভাগ দেখ।

পরিলক্ষিত হইবে। দুই একটা নিদর্শন দিতেছি।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে ভবানন্দ মনে মনে বলিতেছেন—

"যাহা ভবিতব্য তাহা অবশ্য হইবে। আমি ভাগীরথী জলতরঙ্গসমীপে ক্ষুদ্র গজদেহ স্থাপন করিয়া কি করিব? **ইহা আমাকে করিতে হইয়াছে; অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে** * আপনার ওজন আপনি না বুঝিয়া মাণদণ্ডে আমি তুলিত হইতে উঠিয়াছিলাম। যে লোভী, যে পাপিষ্ঠ, যে ইন্দ্রিয়পরবশ, যে অধর্ম্মী তাহার আবার ধর্ম্ম কি? তাহার আবার সত্য কি? পাপে আমার ভয় কি? অনন্ত নরক আমার কপালে নিশ্চিত। ইহজীবন ধ্বংসের সম্ভাবনা, এই ইহজীবন ধ্বংসে আমার ভয় কি? অতএব যাহাই কপালে থাকুক, আমি এ দুষ্কর্ম্ম করিব। এ দিকেও প্রাণ যায়, সেদিকেও প্রাণ যাইবে। যে বিপদ দূরবর্ত্তী তাহাকে উপেক্ষা করিয়া যে বিপদ নিকটবর্ত্তী তাহা হইতে আমাকে উদ্ধার করিতে হয়। আমি ধীরানন্দের পরামর্শ শুনিব না, ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা গুরু"—ইত্যাদি।

৫ম সংস্করণে এই ভবানন্দ এই স্থানে যাহা বলিয়াছে, তাহা ৪২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা তুলনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, পঞ্চম সংস্করণের আনন্দমঠের নীতি মার্জ্জিত হইয়া অতি উচ্চ স্তরে স্থাপিত হইয়াছে।

যেমন ভবানন্দ সম্বন্ধে—তেমনই জীবানন্দ সম্বন্ধে এইরূপ ঘটিয়াছে।

জীবানন্দও পঞ্চম সংস্করণে যেন ঈষৎ পরিবর্ত্তিত। শান্তি তাহাকে এই সংস্করণে প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী নহে বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে—সে কথা বলা হইয়াছে।

সত্যানন্দ সম্বন্ধেও একটা গুরুতর কথা আছে। যখন চিকিৎসক সত্যানন্দকে দেশোদ্ধারব্রত উদ্যাপন করিতে বলেন, তখন তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণে বলিয়াছিলেন—

"সত্যানন্দ কাতর হইও না। যাহা হইবে, তাহা ভালই হইবে। ইংরেজ এক্ষণে রাজা না হইলে"—ইত্যাদি।

নূতন সংস্করণে আছে—

"সত্যানন্দ কাতর হইও না। **তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধনসংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের কখনও পবিত্র ফল হয় না।**"

এই পরিবর্ত্তন একপ্রকার গ্রন্থের অস্থিমজ্জার পরিবর্ত্তন "আনন্দমঠ" উপন্যাসের সত্যানন্দচরিত্র পাঠ করিয়া সকলেরই সহানুভূতি সেই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। অবশ্য তাহাতে আকৃষ্ট হইতে গ্রন্থকার অনুরোধ করিয়াছিলেন—কিন্তু এই পঞ্চম সংস্করণে গ্রন্থকার সেই সত্যানন্দচরিত্রের দোষভাগও দেখাইয়া সাবধান করিয়া দিলেন। এই যাহা তিনি ৫ম সংস্করণে বলিলেন, পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণসময়ে ইহা তাঁহার মনে থাকিলে, "আনন্দমঠ" একপ

* বৃহদক্ষরে আমরাই মুদ্রিত করিলাম।

ভাবে স্পষ্ট হইতে পারিত না। ফলতঃ পরবর্ত্তী সংস্করণে গ্রন্থের মূলভাগ সংশোধন করিতে গেলেই বড় গোলযোগ ঘটে। "আনন্দমঠ" উপন্যাসের ৫ম সংস্করণে বোধ হয় এইরূপ দুইচারিটি গোল ঘটিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র।

তৃতীয় ভাগ।

আনন্দমঠ-দেবী চৌধুরাণী-সীতারাম।

দেবী চৌধুরাণী।

চরিত্রবিশ্লেষণ—ব্যাখ্যা—সমালোচনা।

(১) প্রফুল্ল।

এই প্রফুল্ল সম্বন্ধে গ্রন্থকার গ্রন্থশেষে এইরূপ লিখিয়াছেন,

"এখন এসো, প্রফুল্ল! একবার লোকালয়ে দাঁড়াও—আমরা তোমায় দেখি। একবার এই সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল দেখি,

'আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন। আমি সেই বাক্যমাত্র, কতবার আসিয়াছি, তোমরা আমায় ভুলিয়া গিয়াছ, তাই আবার আসিলাম—

'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥'"

শেষোক্ত এই শ্লোকটি কে কাহাকে বলিয়াছিল, পাঠকবর্গ অবশ্যই জ্ঞাত আছেন। তবু গ্রন্থকারের রীতি অনুসারে আমাদিগকে তাহা একবার বুঝাইয়া বলিতে হইবে।

"শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" নামক অপূর্ব্ব ধর্ম্মগ্রন্থের নাম কে না শুনিয়াছেন? এই শ্লোকটী সেই গ্রন্থ হইতেই উদ্ধৃত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিবার সময়ে এই কথাটি বলিয়াছিলেন। এটি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ৮ম শ্লোক। ইহার অনুবাদ এইরূপ করিতে পারা যায়—

"সাধুগণের পরিত্রাণ, ও দুষ্কৃতি

দুষ্কৃতগণের বিনাশসাধন জন্য এবং ধর্মসংস্থাপন করিতে আমি যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করি।”

সেই কথা আজি গ্রন্থকার প্রফুল্লকে বলিতে বলিতেছেন। এ হেন প্রফুল্ল-চরিত্রে এ অধম লেখকের অতি সন্তর্পণে হস্তক্ষেপ করিতে হয়।

প্রফুল্লজীবনচরিত আমরা প্রথমে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া লইতেছি।

ভবানী পাঠকের সহিত প্রফুল্লের সন্দর্শন পর্য্যন্ত তাহার প্রথম ভাগ। সেই সন্দর্শন হইতে ভবানী পাঠকের দল হইতে প্রফুল্লের বিদায় গ্রহণ পর্য্যন্ত, দ্বিতীয় ভাগ। অবশিষ্ট তৃতীয় ভাগ।

প্রথম ভাগে কবি প্রফুল্লতরুর মৌলিক ক্ষেত্র প্রদর্শন করিয়াছেন; দ্বিতীয় ভাগে সেই ক্ষেত্রে যে বীজ রোপিত হইল, সেই বীজের প্রকৃতি ও রোপণ-প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন। শেষভাগে সেই রোপিত বীজের অঙ্কুর, বৃক্ষ ও ফল দেখাইয়াছেন।

প্রথম ভাগ—

এই ক্ষেত্র-বিচারে অনেক কথা বলা যায়। অনেক দিন হইল, বাবু কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম এ, বি, এল মহাশয় “প্রচারে” এই ক্ষেত্রের মৌলিক প্রকৃতি—নিষ্কামধর্ম-বীজরোপণের উপযোগিতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন, আমরা এখন সেরূপ বলিতে চাহি না। আমরা এখন সেই ক্ষেত্র সম্বন্ধে একটি মাত্র কথা বলিব। কথাটি প্রফুল্লের পতিভক্তি সম্বন্ধে।

[illegible] হইতে [illegible] প্রফুল্লের [illegible] আদর্শ স্তরে স্তরে কি প্রকারে বিকশিত হইয়াছিল, তাহা আমরা অন্যত্র বলিয়াছি। প্রফুল্লের এই পতি-প্রেমের বিকাশ প্রথমে তত খুলে নাই সত্য—কিন্তু পরে ইহার পূর্ণ অবয়ব আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বেশী খুলে নাই, কারণ বেশী খুলিয়া দেখাইবার বিশেষ অবস্থাও ঘটে নাই। প্রফুল্ল স্বামী-সহবাসে বঞ্চিতা। বিরহেই প্রণয় বেশী পুষ্টিলাভ করে। বিরহিণীর প্রণয়ও অনেকস্থানেই বেশী অভিব্যক্ত হয়। কিন্তু যেখানে সেরূপ বাহ্যপ্রদর্শন থাকে না, সেখানে আবার সেই প্রণয় গম্ভীর হইতে গভীরতর হইতে থাকে। প্রফুল্লের পতিপ্রেমও এইরূপ। আমরা দুই একটিবার তাহার অভিব্যক্তি দেখিয়াছি মাত্র—কিন্তু সে প্রেম সাধারণতঃ হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে লুক্কায়িত ছিল। সেই অভিব্যক্তি কিরূপ, তাহা পাঠকগণকে দেখাইতেছি।

“প্র। থাকব বলেই ত এসেছি। থাকতে পেলে ত হয়।

সা। তা দেখ, শ্বশুরের যদি মত না হয়, তবে এখনই চলে যেও না।

প্র। না গিয়া কি করিব? আর কি জন্য থাকিব? থাকি, যদি—

সা। যদি কি?

প্র। যদি তুমি আমার জন্য সার্থক করাইতে পার।

সা। সে কিসে হবে ভাই?

প্রফুল্ল ঈষৎ হাসিল। তখনই হাসি নিবিয়া গেল, চক্ষে জল পড়িল। বলিল “দুঃখ নাই ভাই।”

অন্যত্র—

“প্রফুল্ল [illegible]

নয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। গোড়ারমুখী নয়ন বলিল—"দিদি, কাল রাত্রে কোথা শুইয়াছিলি?"

প্র। ভাই, কেহ তীর্থ করিলে, সে কথা আপনার মুখে বলে না।

এই দুইদিনের প্রফুল্লকে দেখিলে ও শুনিলেই প্রফুল্লের পতিপ্রেমের গভীরতা বুঝা যায়। এ প্রেমে ভোগের তারল্য ছিল না, বিরহের গভীরতা ছিল।

দ্বিতীয় ভাগ—

প্রফুল্লের জীবনের দ্বিতীয় ভাগে তাহার শিক্ষা-প্রণালী বিবৃত হইয়াছে।

প্রথমে প্রফুল্ল লেখাপড়া শিখিল। লেখাপড়া জ্ঞানশিক্ষার প্রধান উপায়। লেখাপড়া না শিখিলে, মৃত মহাত্মাদের প্রচারিত উপদেশ লোকের মুখে শুনা ভিন্ন জানিবার উপায় নাই। সেই লোকের মুখে শুনা সকলের পক্ষে সম্ভাব্য নহে—স্ত্রীলোকদের পক্ষে ত নয়ই। তাই প্রফুল্ল প্রথমে লেখাপড়া শিখিল; বাঙ্গলা লেখাপড়া নহে—যে ভাষা জানিলে নভেল পাঠই পড়ার শেষ সীমা দাঁড়ায়, সে ভাষা নহে—যে ভাষায় ভারতবাসীর অনন্ত রত্নরাশি গ্রথিত আছে, সেই সংস্কৃত ভাষা। প্রফুল্ল সংস্কৃত ভাষা শিখিয়া কিছু দর্শন পড়িল। বুদ্ধিমার্জ্জনার জন্য এমন শাস্ত্র আর নাই। কিন্তু ইহাও প্রফুল্ল বিশেষ করিয়া পড়িল না। প্রফুল্ল বিশেষ করিয়া পড়িল সর্ব্বগ্রন্থশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

জীবনের কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণে উপদেশ পাইতে ভগবদ্গীতার মত গ্রন্থ আর একখানিও নাই। প্রফুল্ল সেই গ্রন্থ পড়িয়া জীবনের কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে শিখিল।

ভগবদ্গীতার প্রধান শিক্ষা—সুখদুঃখ লাভালাভ জ্ঞান পরিবর্জ্জন করিয়া কর্ত্তব্য-অনুষ্ঠান করা। প্রফুল্ল ভবানী পাঠকের নিকটে সেই শিক্ষা লাভ করিলেন। শুদ্ধ সেই শিক্ষা নহে—সেই কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিতে অন্য যে সকল শিক্ষা আবশ্যক, প্রফুল্ল সে সব শিক্ষাও পাইলেন।

এই শিক্ষাই বিস্তৃত ভাবে কবি তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্ব নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। প্রফুল্লের লেখাপড়া শিক্ষা কিরূপ হইল, তাহা বলিয়াছি। অন্য শিক্ষা কিরূপ হইল, সংক্ষেপে বলিতেছি। প্রথম বৎসরে ভবানী পাঠক প্রফুল্লের আহারের ব্যবস্থা করিলেন—মোটা চাউল, সৈন্ধব, ঘি ও কাঁচাকলা। পাঠকবর্গ অবগত আছেন, হিন্দুশাস্ত্রে ইহাকেই সাত্ত্বিক আহার বলে—অর্থাৎ এই আহারে শরীরের যেমন পুষ্টি হয়, তেমনই সত্ত্বগুণেরও বিকাশ হয়। মাংসাদি শরীরের পুষ্টিকর হইলেও সত্ত্বগুণবিরোধী—তাই হিন্দুর প্রধান আহার এইরূপ। পাঠক এখন একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, এই আহারটাকে ধর্ম্মের বাহিরে, শিক্ষার বাহিরে রাখাটা কি যুক্তিসঙ্গত কার্য্য?

প্রফুল্ল আহার করিত ঐরূপ—আবার কাজকর্ম্মও তাহাকে স্বহস্তে করিতে হইত। ইহাতে তাহার শরীর ও মন উভয়ই পুষ্ট হইতে লাগিল। প্রফুল্ল এই নিয়মমতেই চলিতে লাগিল। কিন্তু একাদশীর দিনে সে এ নিয়ম মানিত না। কবি এই একটা কথায় প্রফুল্লের পতিপ্রেম আমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন! প্রফুল্ল

যে এত ব্যাপারের মধ্যেও স্বামীকে ভুলিতে পারে নাই—কোন পত্নীই বা তাহা পারে?—কবি তাহাই এই এক কথায় বুঝাইয়া দিলেন। দ্বিতীয় বৎসরে প্রফুল্লের পক্ষে আহারের ব্যবস্থা হইল—মুন, লঙ্কা, ভাত। আর একাদশীতে মাছ। তাহাতেও প্রফুল্ল কোন আপত্তি করিল না। এই আহারে প্রফুল্লের আহারজনিত কষ্টসহিষ্ণুতা শিক্ষা হইতে লাগিল। প্রথম বৎসরের আহারে শরীর ও মন বিশুদ্ধ হইয়াছিল—কাজেই দ্বিতীয় বৎসরে এ আহারে প্রফুল্লের বিশেষ কোন কষ্ট বা ক্ষতি হইল না, প্রত্যুত কষ্টসহিষ্ণুতা শিক্ষা হইতে লাগিল। তৃতীয় বৎসরে প্রফুল্লের আহারের জন্য ব্যবস্থা পূর্ব্বমতই রহিল—কিন্তু তাহাতে একটু বিশেষত্ব এই হইল যে, এবারে তাহার সম্মুখে বসিয়া নানা প্রকার সুখাদ্য দ্রব্যাদি নিশিকে খাইবার ব্যবস্থা হইল। এ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য লোভসংবরণ শিক্ষা। চতুর্থ বৎসরে প্রফুল্লের প্রতি অতি উপাদেয় ভোজ্য খাইতে আদেশ হইল।

পাঠকগণ আপনারা তন্ত্রশাস্ত্রের পশ্বাচার, বীরাচার ও দিব্যাচারের কথা কিছু জ্ঞাত আছেন কি? তান্ত্রিক পশ্বাচারীকে বৈদিক সাত্ত্বিকবৎ আচার করিতে হয়। প্রফুল্লের ত্রয়বর্ষ পর্য্যন্ত যে আহারের ব্যবস্থা ছিল, তাহা তান্ত্রিক পশ্বাচারের আহারের ব্যবস্থা। পরে এই চতুর্থ বৎসরে প্রফুল্লের প্রতি বীরাচারের আদেশ হইল। অর্থাৎ প্রফুল্লকে প্রথমে পশুর ন্যায় ভয়ে ভয়ে খাদ্যাদি সম্বন্ধে সতর্কতা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সে শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে—প্রফুল্লের আর সে সতর্কতা গ্রহণের আবশ্যকতা রহিল না। তখন বীরভাবে তাহাকে নানাপ্রকার সাত্ত্বিকতাবহিরোধী খাদ্যাদির সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। উদ্দেশ্য এই যে, এই সকল খাদ্যাদিগ্রহণজনিত মন্দ ফলের সহিত প্রফুল্লের পূর্ব্বপ্রকারে শুদ্ধীকৃত সাত্ত্বিক ভাবের সংঘর্ষণ উপস্থিত হউক—প্রফুল্ল বীরভাবে সেই মন্দ ফল পরাজয় করুক। পর বৎসরে প্রফুল্লের প্রতি যদৃচ্ছা ভোজনের উপদেশ হইল; প্রফুল্ল কিন্তু বীরভাবের বিকাশ করিয়া দিব্যভাব গ্রহণ করিলেন। অর্থাৎ পুনরায় প্রথম বৎসরের মত আচার আরম্ভ করিলেন। মহাকবি অজ্ঞাতসারে এইরূপ তন্ত্রের আচার ব্যাখ্যা করিলেন। এমন কোন নূতন কথা বাহির করা বড় সহজ নহে, যাহা এই বিশাল হিন্দুধর্ম্মের কোন শাস্ত্রকার বলিয়া যান নাই।

যেমন আহার সম্বন্ধে—তেমনই শয়ন, স্নান, নিদ্রা সম্বন্ধেও এইরূপ ব্যবস্থা হইল। এ সকল শিক্ষায় প্রথমে প্রফুল্লের বলসঞ্চয় হইল; পরে কার্য্যক্ষেত্রে সেই বলের পরীক্ষা হইল; পরীক্ষান্তে পুনরায় সেই বলরক্ষণের চেষ্টা হইল।

যেমন এই সকল আহারবিহারাদির শিক্ষা, তেমনই শারীরিক বৃত্তি সকলের অনুশীলনের ব্যবস্থাও হইল। ফলতঃ প্রফুল্ল এইরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইল, যাহাতে তাহার শারীরিক, মানসিক সর্ব্ববিধ বৃত্তিই সামঞ্জস্যরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইল। এই শিক্ষাই মহাকবির আদর্শ শিক্ষা। ধর্ম্মতত্ত্বে ইহাই বিবৃত হইয়াছে। ফলতঃ প্রফুল্লই সজীব 'ধর্ম্মতত্ত্ব'। প্রফুল্লের শরীর ও মন উভয়ই সুশিক্ষিত হইল। শারীরিক শিক্ষা না হইলে, ইন্দ্রিয়দমনাদি ও দুঃখাদি

সহন গুণ সহজে জন্মে না, তাই প্রফুল্লকে সে শিক্ষাও করিতে হইয়াছিল।

তৃতীয় ভাগ—

প্রফুল্ল-জীবনের দ্বিতীয় ভাগের এই শিক্ষা প্রফুল্ল কিরূপে কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন, তাহাই তৃতীয় ভাগে প্রদর্শিত হইয়াছে।

তৃতীয় ভাগে সেই শিক্ষা-ফল প্রদর্শনটিতে কিছু কাব্য জমিয়াছে। কথাটা খুলিয়া বলিতেছি।

পাঠকবর্গ অবগত আছেন, প্রফুল্ল বনমধ্যে কিছু অর্থ পাইয়াছিল। ঐ অর্থের ব্যবহার কিরূপে করিতে হইবে, তজ্জন্য প্রফুল্ল একদিন কিছু ব্যতিব্যস্তও হইয়া উঠিয়াছিল। এ সম্বন্ধে ভবানী পাঠকের সহিত তাহার যে কথোপকথন হইয়াছিল, পাঠকবর্গ তাহা স্মরণ করুন—প্রফুল্ল সে সময়ে ভবানী পাঠকের সহিত একমত হইয়া স্থির করিয়াছিল—ধন কিছু তাঁহার দেহ রক্ষার জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট সব শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিবে। শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে সে ধন পৌছাইবার উপায়ও প্রফুল্ল জানিত। তাই প্রফুল্ল স্থির করিয়াছিল; সর্ব্বভূতে সে ধন বিতরণ করিবে—তাহা হইলে সর্ব্বভূতাত্মক ভগবানে সে ধন অর্পণ করা হইবে। এ পর্য্যন্ত সকলই অতি পরিষ্কার দেখিলাম। কিন্তু এখান হইতেই গোল আরম্ভ হইল।

যখন এইরূপ স্থির হইল, তখন ভবানী পাঠক বলিলেন।

"কিন্তু এই সর্ব্বভূতসংক্রামক দানের জন্য অনেক কষ্ট, অনেক শ্রমের প্রয়োজন। তাহা তুমি পারিবে?"

"প্র। এতদিন কি শিখিলাম?"

ভ। সে কষ্টের কথা বলিতেছি না। কখন কখন কিছু দোকানদারি চাই। কিছু বেশবিন্যাস, কিছু ভোগবিলাসের ঠাট প্রয়োজন হইবে। সে বড় কষ্ট। তাহা সহিতে পারিবে?

প্র। আমার কাছে শ্রীকৃষ্ণের যে ধন আছে, কিছু আপনার কাছে থাক্। এই ধন লইয়া ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত থাকুন। দুষ্কার্য্য হইতে ক্ষান্ত হউন।"

প্রফুল্ল যে ভবানী পাঠকের এ কার্য্য সহসা নির্দ্দোষ বা অনুষ্ঠেয় বলিয়া বিবেচনা করে নাই, কবি তাহাই দেখাইলেন। কিন্তু প্রফুল্লের এ কথা শুনিয়া ভবানীপাঠক তাহার নিকট অনেক বক্তৃতা করিলেন। "ওজস্বী বাক্যপরম্পরার সংযোগে দেশের দুরবস্থা বর্ণনা করিলেন, ভূম্যধিকারীর দুর্ব্বিসহ দৌরাত্ম্য বর্ণনা করিলেন। কাছারীর কর্ম্মচারীরা বাকীদারের ঘরবাড়ী লুঠ করে, লুকান ধনের তল্লাসে ঘর ভাঙ্গিয়া, মেঝ্যা খুঁড়িয়া দেখে, পাইলে এক গুণের জায়গায় সহস্র গুণ লইয়া যায়, না পাইলে মারে, বাঁধে, কয়েদ করে, পোড়ায়, কুড়ুল মারে, ঘর জ্বালাইয়া দেয়, প্রাণে বধ করে। সিংহাসন হইতে শালগ্রাম ফেলিয়া দেয়, শিশুর পা ধরিয়া আছাড় মারে, যুবাকে, বুকে বাঁশ দিয়া দলে, বৃদ্ধের চোখের ভিতর পিঁপড়ে, নাভিতে পতঙ্গ পূরিয়া বাঁধিয়া রাখে। যুবতীকে কাছারিতে লইয়া গিয়া সর্ব্বসমক্ষে উলঙ্গ করে, মারে, স্তন কাটিয়া ফেলে, স্ত্রীজাতির যে শেষ অপমান, চরম বিপদ সর্ব্বসমক্ষেই তাহা প্রাপ্ত করায়। এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার প্রাচীন কবির ন্যায় অত্যুন্নত শব্দচ্ছটা-বিন্যাসে বিবৃত করিয়া,

ভবানীঠাকুর বলিলেন 'এই দুরাত্মাদিগের আমিই দণ্ড দিই। অনাথা দুর্ব্বলাকে রক্ষা করি। কি প্রকারে করি, তাহা তুমি দুই দিন সঙ্গে থাকিয়া দেখিবে ?"

এ অত্যাচারের এরূপ কাহিনী শুনিয়া কাহার না দুঃখ হয় ? কাহার না হৃদয় গলিয়া যায় ? প্রফুল্ল ত তখন জীবের প্রতি দয়া পূর্ণ মাত্রায় বিকাশ করিয়াছিলেন—একথা এইরূপ ভাবে শুনিয়া তিনি কি আর ইহার বৈধাবৈধতার পরীক্ষা করিতে চাহিতে পারেন ? তাই প্রফুল্ল তখনই বলিলেন "আমি সঙ্গে যাইব।" ভবানী বলিলেন, "এই কাজে দোকানদারী চাই, বলিতেছিলাম। যদি আমার সঙ্গে যাও, কিছু কিছু ঠাট সাজাইতে হইবে, সন্ন্যাসিনী বেশে এ কাজ সিদ্ধ হইবে না।" পূর্ব্বে এরূপ প্রস্তাবে প্রফুল্ল কি উত্তর করিয়াছিল, তাহা পাঠকবর্গকে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, কিন্তু এখন প্রফুল্ল বলিলেন, "কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছি। কর্ম্ম তাঁহার, আমার নহে। কার্য্যোদ্ধারের জন্য যে সুখ দুঃখ, তাহা আমার নহে, তাঁরই।" তাঁর কার্য্যের জন্য যাহা করিতে হয় করিব।"

মহেন্দ্রের সন্তানধর্ম্মগ্রহণ দেখিয়াছ, এখন প্রফুল্লের এই ভবানী পাঠকের কথিত ধর্ম্মগ্রহণ প্রত্যক্ষ কর। অনেকটা একরূপই নয় কি ? সেই সত্যানন্দ ও এই ভবানীর ন্যায় নেতা হইলে, প্রফুল্লের ন্যায় রমণী, মহেন্দ্রের ন্যায় পুরুষকেও তাঁহাদিগের পথে চলিতে হয়।

প্রফুল্ল-জীবনের এই ভাগে তাঁহার নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানের একটা বিষম পরীক্ষাকাল উপস্থিত হইল। উচ্চ শিক্ষা যতই হউক, রমণীত্ব কিছু ধ্বংস হইবার নহে। পতিপ্রেম রমণীর একটা প্রধান রমণীত্ব। প্রফুল্লের সেই রমণীত্ব বা পতিপ্রেম সহিত সেই শিক্ষার কিরূপ সংযোগ হইয়াছিল, তাহাই সেই পরীক্ষার দ্রষ্টব্য বিষয়।

কবি সেই মহাপরীক্ষা দেখাইতে ব্রজেশ্বরকে সেই সুশিক্ষিতা নিষ্কামকর্ম্মা বলস্বিনী প্রফুল্লের সমীপে উপস্থিত করিলেন। প্রফুল্ল তখন সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিতে উপদিষ্ট হইতেছেন, অনেক সময়ে নিজে তাহাই করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনেও করিতেছেন এমন সময়ে, খানিকটা দৈবঘটনায়, খানিকটা প্রফুল্লের ষড়যন্ত্রে (নিরপরাধিনী পতিপ্রাণা সাগরের উপকারার্থ এই ষড়যন্ত্র) ব্রজেশ্বর দেবীচৌধুরাণীর বজরায় উপনীত হইলেন।

"দেবী জিজ্ঞাসা করিল 'আপনি কে ?' দেবীর যেন বিষম লাগিয়াছে—গলার আওয়াজটা বড় করসা নয়। ব্রজেশ্বর বলিলেন 'পরিচয় লইয়া কি হইবে ? আমার ধনের সঙ্গে আপনাদিগের সম্বন্ধ, তাহা পাইয়াছেন—নামে ত টাকা হইবে না ?' দেবী। 'হইবে বৈ কি ? আপনি কি দরের লোক, তাহা জানিলে টাকার ঠিকানা হইবে।' তবু গলাটা ধরা ধরা। ব্রজ। 'সেই জন্যই কি আমাকে ধরিয়া আনিয়াছেন ?' দেবী বলিলেন, 'নতুবা আপনাকে আমরা আনিতাম না।' দেবী পরদার আড়ালে ; কেহ দেখিল না যে, এই কথা বলিবার সময় দেবী চোখ মুছিল। * * * এই সময়ে দেবীর কাছে, আর

একজন স্ত্রীলোক নিঃশব্দে আসিয়া বলিল, 'বলি গলাটা ধরে গেছে যে।"

দেবীর চক্ষের জল আর থাকিল না। বর্ষাকালের ফুটন্ত ফুলের ভিতর যেমন বৃষ্টির জল পোরা থাকে, ডাল নাড়া দিলেই জল ছড় ছড় করিয়া পড়িয়া যায়, দেবীর চোখে তেমনি জল পোরা ছিল, ডাল নাড়া দিতেই ঝর ঝর করিয়া পড়িয়া গেল। দেবী তখন, ঐ স্ত্রীলোককে কানে কানে বলিল "আমি আর এ রঙ্গ করিতে পারি না। তুই কথা ক'। সব জানিস্ ত ?"

তার পরে প্রফুল্লের সাহত ব্রজেশ্বরের যেরূপ আলাপ হইল, পাঠকবর্গ স্মরণ করিয়া দেখুন। এই কথোপকথনের শেষে ব্রজেশ্বর চলিয়া গেল—

"এ দিকে নিশি আসিয়া দেবীর শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, দেবী নৌকায় তক্তার উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে। নিশি তাহাকে উঠাইয়া বসাইল—চোকের জল মুছাইয়া দিল—সুস্থির করিল। তখন নিশি বলিল, 'এই কি মা তোমার নিষ্কাম ধর্ম্ম ? এই কি সন্ন্যাস ? ভগবদ্বাক্য কোথায় মা, এখন ?' দেবী চুপ করিয়া রহিল। নিশি বলিল, 'ও সকল ব্রত মেয়েমানুষের নহে। যদি মেয়েকে ও পথে যেতে হয়, তবে আমার মত হইতে হইবে। আমাকে কাঁদাইবার জন্য ব্রজেশ্বর নাই। আমার ব্রজেশ্বর বৈকুণ্ঠেশ্বর একই।' দেবী চক্ষু মুছিয়া বলিল, তুমি যমের বাড়ী যাও।' নিশির 'আপত্তি ছিল না। কিন্তু আমার উপর যমের অধিকার নাই। তুমি সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া ঘরে যাও।' দেবী। 'সে পথ খোলা থাকিলে, আমি এ পথে আসিতাম না।'

এই কথোপকথন হইতেই উপন্যাসের মূল তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। সেই তত্ত্ব এই যে, সন্ন্যাসে পতিযুক্তার অধিকার নাই। হিন্দুশাস্ত্রেরও এই উপদেশ। কিন্তু আমাদিগের কবি, শাস্ত্রের উপর নির্ভর না করিয়া, ঘটনাচক্রে সেই উপদেশ পালন ও লঙ্ঘনের ফল, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারামে দেখাইয়া, সেই তত্ত্ব বা উপদেশ সমর্থন করিয়াছেন। তিনি এখানে দেখাইয়াছেন যে, অমন সুশিক্ষিতা প্রফুল্লও, সন্ন্যাসধর্ম্মপালন করিতে যাইয়া, অকৃতকার্য্য হইল—এবং তাহার সন্ন্যাসে অধিকার নাই ইহাই স্থির করিল। সীতারাম উপন্যাসেও শ্রী ইহা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছে—সে কথা যথা স্থানে বর্ণিত হইবে।

এই ঘটনায় দেবীচৌধুরাণীর হৃদয়ে মহা বিপ্লব উপস্থিত হইল। ঘটনা ত সামান্য নহে—বিপ্লব হইবারই কথা। প্রফুল্লের সেই হৃদয়বিপ্লব নিম্নলিখিত কথোপকথনে সুস্পষ্ট পরিদৃষ্ট হইবে।

"ভবানী। রাগ কর কেন ? আমরা যে অভিপ্রায়ে ডাকাইতি করি, তা মন্দ কাজ বলিয়া আমরা জানি না। তাহা হইলে একদিনের তরেও ঐ কাজ করিতাম না, তুমিও একাজ মন্দ মনে কর না, বোধ হয়—কেন না তাহা হইলে এ দশবৎসর—

দেবী। সে বিষয়ে আমার মত

ফিরিতেছে। আমি আপনার কথায় এতদিন ভুলিয়াছিলাম—আর ভুলিব না। পরদ্রব্য কড়িয়া লওয়া মন্দ কাজ নয় ত মহাপাতক কি? আপনাদের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধই রাখিব না।

ভবানী। সে কি? যা এতদিন বুঝাইয়া দিয়াছি, তাই কি আবার তোমায় বুঝাইতে হইবে? * * * দেশ অরাজক, দেশে রাজশাসন নাই, দুষ্টের দমন নাই, যে যার পায় কাড়িয়া খায়। আমরা তাই তোমায় রাণী করিয়া, রাজশাসন চালাইতেছি। তোমার নামে, আমরা দুষ্টের দমন করি, শিষ্টের পালন করি। এ কি অধর্ম্ম?

দেবী। রাজরাণী, যাকে করিবেন, সেই হইতে পারিবে। আমাকে অব্যাহতি দিন্‌—আমার এ রাণীগিরিতে আর চিত্ত নাই।

ভবানী। আর কাহাকেও এ রাজ্য সাজে না। আর কাহারও অতুল ঐশ্বর্য্য নাই—তোমার ধনদানে সকলেই তোমার বশ।

দেবী। আমার যে ধন আছে, সকলই আমি আপনাকে দিতেছি। আমি ঐ টাকা যেরূপে খরচ করিতাম, আপনিও সেইরূপ করিবেন। আমি কাশী গিয়া বাস করিব, মানস করিয়াছি।

* * *

ভবানী। তুমি যদি অখ্যাতির ভয় কর, তবে তুমি আপনার খুঁজিলে, পরের ভাবিলে না। আত্মবিসর্জ্জন হইল কৈ?

দেবী। আপনাকে আমি তর্কে আঁটিয়া উঠিতে পারিব না—আপনি মহামহোপাধ্যায়—আমার স্ত্রী-বুদ্ধিতে যাহা আসিতেছে, তাই বলিতেছি—আমি এ রাণীগিরি হইতে অবসর লইতে চাই। আমার এ আর ভাল লাগে না।

* * *

ভ। ক্ষতি নাই—কিন্তু সম্প্রতি অনেক গুলি লোক দরিদ্রাগ্রস্ত—ইজারাদারের দৌরাত্মে সর্ব্বস্ব গিয়াছে। এখন কিছু কিছু পাইলেই, তাহারা আহার করিয়া গায়ে বল পায়। গায়ে বল পাইলেই, তাহারা লাঠিবাজি করিয়া আপন আপন স্বত্ব উদ্ধার করিতে পারে। শীঘ্র একদিন দরবার করিয়া তাহাদিগের রক্ষা কর।

দে। তবে প্রচার করুন যে, এই খানেই আগামী সোমবার দরবার হইবে।

ভ। না। এখানে আর তোমার থাকা হইবে না। * * * ইচ্ছামত টাকা সঙ্গে লইয়া, আজি বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে যাত্রা কর।

দে। এবার চলিলাম। কিন্তু আর আমি এ কাজ করিব কি না সন্দেহ। ইহাতে আর আমার মন নাই।

এই কথোপকথন শুনিয়া দেখিলাম—প্রফুল্ল ভবানী পাঠকের কার্য্যে বিরক্ত প্রকাশ করিতেছে। প্রথমে যখন ভবানী পাঠক এইরূপ কার্য্যের প্রস্তাব করে, তখনও প্রফুল্ল প্রথমে তাহাতে যোগ দিতে অসম্মত হয়। কিন্তু পরে ভবানী পাঠকের কৌশলে তাঁহার অপূর্ব্ব বাগ্মিতায় দরিদ্র ও অত্যাচারিতের প্রতি সহানুভূতি জন্মিয়া, প্রফুল্লের তাহাতে মত হইল। এবং প্রফুল্ল তদনুযায়ী বহুদিন কার্য্যও করিলেন। ডাকাতি অবশ্য করেন নাই—কিন্তু যাহারা ডাকাতি করিত, তাহাদের

সঙ্গে থাকিতেন। কিন্তু অগ্র আবার প্রফুল্লের মতি ফিরিল। কেন ফিরিল, গ্রন্থকার তাহা এস্থলে নিজে কিছু বলেন নাই—আমরা তাহাই বলিতেছি।

বহুদিন প্রফুল্ল স্বামিসন্দর্শনে বঞ্চিত ছিলেন। এই অদর্শন প্রফুল্লের চিত্ত হইতে স্বামিচিন্তা একেবারে উন্মূলিত করিতে পারে নাই সত্য—সেই একাদশীর দিনে চেষ্টা করিয়া মৎস্য খাইবার কথাটায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে—তবু কালের যে একটা প্রভাব আছে, তাহাও তাহার চিত্তে কিছু কার্য্য না করিয়াছিল এমন নহে। যদি বিশেষ কোন কার্য্যে ব্রতী না থাকিতে হইত, প্রফুল্ল সে কালের প্রভাবও পরাজয় করিতে পারিতেন—কিন্তু যে ব্রত তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ব্রত পালন করিতে তাঁহাকে স্বামিচিন্তা হইতে অনেক সময়ে বিরত থাকিতে হইত। তাই আমরা অনুমান করি, ধীরে অজ্ঞাতসারে, কতক শিক্ষার, কতক কালের, কতক কার্য্য বিশেষের প্রভাবে ব্রজেশ্বর চিন্তা তাহার মনে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। ব্রজেশ্বর যেমন মন হইতে সরিয়া যাইতেছিল—সংসারও তেমনই সঙ্গে সঙ্গে সরিয়া যাইতেছিল। যেমন সংসার সরিতেছিল, ভবানী পাঠকের উপদিষ্ট কার্য্যে তেমনই মন বাঁধিতেছিল। মন একটা লইয়া ত থাকিবেই। তাই প্রফুল্লের এই কয়েক বৎসরের কার্য্যে আমরা ব্রজেশ্বরের কোন সম্বন্ধ পাই নাই। কিন্তু আজি ব্রজেশ্বর সম্মুখে উপস্থিত—সেই ব্রজেশ্বরকে দেখিয়া প্রফুল্লের নিদ্রিত স্মৃতিগুলি আস্তে আস্তে মাথা জাগাইল—সংসারও আসিয়া ব্রজেশ্বরের সঙ্গে মিশিয়া প্রফুল্লের চিত্ত কতক অধিকার করিল। তাই প্রফুল্ল বলিল—"সে পথ খোলা থাকিলে, আমি এ পথে আসিতাম না।" সে পথের প্রতি সতৃষ্ণ প্রিয় দৃষ্টি পড়িবামাত্র অবলম্বিত পথের প্রতি বিরক্তি-দৃষ্টি পড়িল। তাই প্রফুল্ল আজ ভবানী পাঠকের নিকটে আর সেরূপ কার্য্য করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিল। ব্রজেশ্বর এ কথা অবশ্য তাহাকে বলে নাই, অন্য কেহও বলে নাই। ব্রজেশ্বরকে দেখিয়াই এতটা ঘটিয়া গেল। একদিন আমরা কলঙ্কিনী পদ্মাবতীকেও পতিদর্শনে এইরূপ মতি পরিবর্ত্তন করিতে দেখিয়াছিলাম। পাঠক এ তত্ত্বটি বড় সুন্দরই প্রকাশিত হয় নাই কি?

প্রথম পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল। পরীক্ষান্তে প্রফুল্ল বুঝিতে পারিলেন যে, ভবানী পাঠকের উপদেশ মত কার্য্য করা তাঁহার পক্ষে উচিত হয় নাই।

পরে আর এক পরীক্ষা উপস্থিত হইল।

পাঠকগণ একবার সেই বৈশাখী শুক্লা-সপ্তমীর কথা মনে করুন। দেবীচৌধুরাণী উপন্যাসে সে বড় চিরস্মরণীয় দিন।

সে দিন ব্রজেশ্বরের সহিত প্রফুল্লের পুনর্ব্বার সাক্ষাতের দিন।

"দেবী সেই ঘাটে—যে ঘাটে বজরা বাঁধিয়া ব্রজেশ্বরকে বন্দী করিয়া আনিয়াছিল, সেই ঘাটে। সবে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে মাত্র। সেই বজরা তেমনই সাজান—সব ঠিক সে রকম নয়। * * *

"* * * দেবী নিজে তেমন রত্নাভরণ-ভূষিতা মহার্ঘ বস্ত্র পরিহিতা নয়; কিন্তু আর এক প্রকারের শোভা আছে। ললাট, গণ্ড, বাহু, হৃদয় সর্ব্বাঙ্গ সুগন্ধি

চন্দন চর্চ্চিত ; চন্দন চর্চ্চিত ললাট বেষ্টন করিয়া স্থগন্ধি পুষ্পের মালা শিরোদেশের বিশেষ শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। হাতে ফুলের বালা। অন্য অলঙ্কার একখানিও নাই। পরণে সেই মোটা সাড়ী।

আজ দেবী স্বামি-সমাগম ভরসায় সেই স্থানে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

বাহিরের বেশ ত কবি পরিষ্কার করিয়াই দেখাইয়াছেন প্রফুল্লের ভিতরের বেশটা এই সময় একবার দেখিতে হয়।

পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, প্রফুল্ল যে পথে এত দিন চলিতেছিলেন, সে পথে আর চলিতে চাহিতেছিলেন না! কেন যে এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিল, তাহাও বলিয়াছি। প্রফুল্ল যে মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারিলেন, তিনি যে পথে চলিতেছিলেন, সে পথ তাঁহার পক্ষে অবলম্বনীয় নহে, অথচ সংসারেও তাঁহার স্থান নাই—তখন হইতে তাঁহার মন কেমন একটা উদাস ভাব অবলম্বন করিয়াছিল। যেমন জোয়ার বা ভাঁটা হইবার পূর্ব্বে জলরাশি ধীর, স্থির, উদাস ভাবে পড়িয়া থাকে, তাঁহার মন তেমনই ভাবে অবস্থান করিতেছিল! এইরূপ সময়ে সকলেরই একটা বিবেক-বুদ্ধি উপস্থিত হয়—সন্ন্যাসিনী প্রফুল্লের ত তাহা হইবারই সম্ভাবনা। সেই বিবেক উপস্থিত হইলে, প্রফুল্লের স্বতঃ উচ্চ অন্তঃকরণ আরো উচ্চতর হইয়া উঠিল। মন যখন সেইরূপ উচ্চ স্বরে বাঁধা ছিল, তখন প্রফুল্ল দিবার সহিত নিম্নলিখিত কথোপকথন করিতেছিলেন। প্রফুল্ল বাল্যাবধি বিশেষ গম্ভীরা—সে গাম্ভীর্য্য এখন চরম সীমায় উপনীত হইল।

দিবা বলিতেছিল—"হাঁঃ, পরমেশ্বরকে না কি আবার প্রত্যক্ষ দেখা যায়?"

"প্রফুল্ল বলিল—'না প্রত্যক্ষ দেখা যায় না। কিন্তু আমি প্রত্যক্ষ দেখার কথা বলিতেছিলাম না—আমি প্রত্যক্ষ করার কথা বলিতেছিলাম।"

এই জ্ঞানগর্ভ কথোপকথন সকল পাঠকেরই বিশেষ স্মরণ আছে এরূপ মনে করি—সুতরাং আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখান আবশ্যক মনে করিলাম না।

এই কথোপকথন-সময়ে আমরা প্রফুল্লের মুখে শুনিতে পাইলাম, ইংরাজের সিপাহী তাহাকে ধরিতে আসিতেছিল। সে স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"দিবা। প্রত্যক্ষের জন্য আবার সাহায্য কি রকম? দেখ, এই নদী জল, গাছ পালা, নক্ষত্র সকল আমি বিনা সাহায্যে দেখিতে পাইতেছি।

"সকলই নয়। ইহার একটি উদাহরণ দিব?" বলিয়া প্রফুল্ল হাসিল। হাসির রমকটা দেখিয়া নিশি জিজ্ঞাসা করিল, 'কি?' প্রফুল্ল বলিতে লাগিল, 'ইংরেজের সিপাহী আমাকে আজ ধরিতে আসিতেছে, জান?"

ইংরাজের সিপাহী প্রফুল্লকে ধরিতে পারিলে, প্রফুল্লের কি হইবে, তাহা প্রফুল্ল জানিত। প্রফুল্ল জানিত যে ইংরাজের বিচারে তাহার শাস্তি ফাঁসি বা ততোধিক কষ্টদায়ক মৃত্যু। ইহা জানিয়াও প্রফুল্ল, স্থিরা, ধীরা, গম্ভীরা, নিশ্চেষ্টা, দিবাকে তত্ত্বকথা বুঝাইতে নিরতা!

পাঠক মনে করিবেন না যে, কেবলমাত্র প্রফুল্লের শিক্ষাতেই তাহাকে আজ এতটা স্থির রাখিয়াছিল—সুশিক্ষা তাহার স্থির থাকিবার অন্যতম কারণ বটে, কিন্তু

মুখ্য কারণ নহে। আজ তাহার এরূপ ভাবের মুখ্য কারণ—তাহার সেইদিনকার ব্রজেশ্বর-সাক্ষাৎ।

মরণের ভয় মানুষের স্বাভাবিক। কিন্তু স্থলবিশেষে এই মৃত্যুভয় হইতে ভীত না হওয়াও মানুষের স্বাভাবিক। আমি সাধারণ মানুষের কথাই বলিতেছি। তুমি আমি অবশ্য মৃত্যুকে ভয় করি—কিন্তু আবার তোমার আমার মনেরও এমন অবস্থা হয় যে, তখন মৃত্যুভয় আমাদিগের হৃদয়ে স্থান পায় না। প্রফুল্ল রমণী হইলেও, সুশিক্ষিতা রমণী। একে তোমার আমার মত পুরুষের ন্যায় অমন মহামহিমময়ী জ্ঞানবতীর মৃত্যুভয় না থাকিবারই সম্ভব—তাহাতে আবার প্রফুল্ল সে দিন ব্রজেশ্বরের সাক্ষাৎলাভানন্তর যেরূপ হইয়া পড়িয়াছিল—তাহাতে তাহার মৃত্যুভয় থাকিবে কেন? প্রফুল্ল যেন তখন মৃত্যুই চাহিতেছিল, অবশ্য মৃত্যু প্রার্থনা করা তাহার ন্যায় লোকের পক্ষে সম্ভব নহে—তবু যেন তাহার হৃদয়ে এমনই একটা ভাব হইয়াছিল যে, মৃত্যু তাহার পক্ষে কিছু প্রিয় বোধ হইতে লাগিল। হৃদয়ে যখন সেই ভাব, তখন প্রফুল্ল দিবার সহিত ঈশ্বর সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছিলেন। হৃদয়ের যখন সেই ভাব—তখনই নিশির কথার উত্তরে দেবী বলিলেন—

"যদি প্রাণের জন্য আমি এত কাতর হইব, তবে আমি সকল সংবাদ জানিয়া শুনিয়া এখানে আসিলাম কেন?"

"তোমার সাধ্য কি দিবা? যা আমি স্থির করিয়াছি তা অবশ্য করিব। আজ স্বামিদর্শন করিব, স্বামীর অনুমতি লইয়া জন্মান্তরে তাঁহাকে কামনা করিয়া প্রাণ সমর্পণ করিব। * * * একা ধরা দিব, আমি একা ফাঁসি যাব সেই জন্যই বজরা হইতে আর সকলকে বিদায় দিয়াছি।"

ইহা পড়িয়া আমরা কি বুঝিলাম, কি দেখিলাম? আমরা বুঝিলাম যে, প্রফুল্ল পূর্ব্ব হইতেই মৃত্যুজন্য প্রস্তুত—ইচ্ছা করিলে সে মৃত্যুপথ হইতে অনায়াসেই আপনাকে স্থানান্তরিত করিতে পারিত—কিন্তু প্রফুল্ল তাহা করিতে অসম্মত। ইচ্ছা করিলে ইংরাজের সিপাহীকে যুদ্ধ করিয়া হটাইয়া দিতেও বুঝি সমর্থ ছিল, তবু প্রফুল্ল তাহাতে অসম্মত—কারণ প্রফুল্ল একা মরিতে চাহে, তাহার জন্য একটীও প্রাণিহত্যা না হয়, তাহাই তাহার ইচ্ছা।

এইরূপ ইচ্ছার কারণ আমরা পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করিয়াছি। প্রফুল্লের পক্ষে সেই শুক্ল সপ্তমী বড় শুভদিন। সেই দিনের মধ্যে আবার যে ক্ষণে তাহার সহিত ব্রজেশ্বরের সাক্ষাৎ হইল, সে বড় শুভক্ষণ। আমরা সেই ক্ষণের কথা বলিব। আজ প্রফুল্ল দূরবীণ লইয়া দেখিল, ব্রজেশ্বর আসিতেছেন।

"ব্রজেশ্বর নিকটে আসিলে, প্রফুল্ল উঠিয়া দাঁড়াইয়া অবনত মস্তকে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। পরে উভয়ে বসিলে ব্রজেশ্বর বলিল 'আজ টাকা আনিতে পারি নাই, দুই চারি দিনে দিতে পারিব, বোধ হয়। দুই চারি দিন পরে কবে কোথায় তোমার সঙ্গে দেখা হইবে, সেটা জানা চাই।'"

গ্রন্থকার লিখিলেন—"ও ছি! ছি! ব্রজেশ্বর! দশবছরের প্রফুল্লের সঙ্গে এই কি কথা!"

"দেবী উত্তর করিল—'আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হইবে না—" বলিতে বলিতে দেবীর গলাটা বুজিয়া আসিল দেবী একবার চোক মুছিল—"আমার সঙ্গে আর দেখা হইবে না, কিন্তু আমার ঋণ শুধিবার অন্য উপায় আছে। যখন সুবিধা হইবে এই টাকা গরিব দুঃখীকে বিলাইয়া দিবেন—তাহা হইলেই আমি পাইব।"

"ব্রজেশ্বর দেবীর হাত ধরিল। বলিল 'প্রফুল্ল! তোমার টাকা'—ছাই টাকা! কথা শেষ হইল না—মুখের কথা মুখে রহিল। যেমন ব্রজেশ্বর "প্রফুল্ল" বলিয়া ডাকিয়া হাত ধরিয়াছে, অমনি প্রফুল্লের দশ বছরের বাঁধা বাঁধ ভাঙ্গিয়া চোখের জলের স্রোত ছুটিল।"

ব্যাপার দেখিয়া মনোরমার সেই কথা মনে পড়িল। সেই ভাগীরথীস্রোতে ঐরাবতের কথা মনে পড়িল।

একস্থলে প্রফুল্ল বলিয়াছেন—

"আমি ডাকাইত নই। আমি তোমার কাছে শপথ করিতেছি, আমি কখন ডাকাইতি করি নাই। কখন ডাকাইতির এক কড়া লই নাই। তুমি আমার দেবতা আমি অন্য দেবতার অর্চ্চনা করিতে শিখিতেছিলাম—শিখিতে পারি নাই; তুমিই সব দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছ—তুমিই একমাত্র আমার দেবতা।

অন্যত্র—

"ব্র। নিশ্চিত ধরা দিবে, স্থির করিয়াছ?

প্র। আর বাঁচিয়া কি হইবে? তোমার দেখা পাইলাম, তোমাকে মনের কথা বলিলাম, তুমি আমায় ভালবাস, তাহা শুনিলাম। আমার যে কিছু ধন ছিল, তাহাও বিলাইয়া শেষ করিয়াছি। আর এখন বাঁচিয়া কোন্ কাজ করিব, বা কোন্ সাধ মিটাইব? আর বাঁচিব কেন?

ব্র। বাঁচিয়া, আমার ঘরে গিয়া আমার ঘর করিবে।

প্র। সত্য বলিতেছ?

ব্র। তুমি আমার কাছে শপথ করিয়াছ, আমিও তোমার কাছে শপথ করিতেছি। আজ যদি তুমি প্রাণ রাখ, আমি তোমাকে আমার ঘরণী গৃহিণী করিব।

প্র। আমার শ্বশুর কি বলিবেন?

ব্র। আমার বাপের সঙ্গে আমি বোঝা পড়া করিব।

প্র। হায়! এ কথা কাল শুনি নাই কেন?

ব্র। কাল শুনিলে কি হইত?

প্র। তা হইলে কার সাধ্য আজ আমায় ধরে?"

তার পরে যখন বিপদ নিকটবর্ত্তী হইল, প্রফুল্ল সকলকেই প্রাণ বাঁচাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন; ব্রজেশ্বরকে তথা হইতে সত্বর যাইতে বলিলেন—কিন্তু ব্রজেশ্বর তাহা শুনিল না। প্রফুল্ল দেখিলেন, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া ব্রজেশ্বর যাইতে চাহিতেছেন না, সুতরাং ব্রজেশ্বরের প্রাণরক্ষার্থ তাঁহার প্রাণরক্ষা আবশ্যক। তাই তিনি, নিজের প্রাণরক্ষার্থও উপায় করিতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু ক্ষণপরে ভাবিয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রাণরক্ষা

করিতে গেলে, তাঁহার শ্বশুরের প্রাণ-নাশের সম্ভাবনা। কাজেই কথাটা তাঁহাকে ব্রজেশ্বর সমীপে জানাইতে হইল। ব্রজেশ্বর বলিলেন—"তোমার আত্মরক্ষার আগে, আমার তার প্রাণ রাখিবার আগে আমার পিতাকে রক্ষা করিতে হইবে।" প্রফুল্ল বলিলেন "সে জন্য চিন্তা নাই। আমার রক্ষা হইবে না, অতএব তাঁর কোন ভয় নাই। তিনি তোমার রক্ষা করিলে করিতে পারিবেন। তবে ইহাও তোমার মনস্তুষ্টির জন্য আমি স্বীকার করিতেছি যে, তাঁর অমঙ্গল সম্ভাবনা থাকিতে আমি আত্মরক্ষার কোন উপায় করিব না। তুমি বলিলেও করিতাম না, না বলিলেও করিতাম না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও।"

এখানে গ্রন্থকারই আমাদিগের আসনে অবতরণ করিয়া লিখিলেন—"হরবল্লভ তখন দেবীর সর্ব্বনাশ করিতে নিযুক্ত। তবু দেবী তার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী। কেন না প্রফুল্ল নিষ্কাম। যার ধর্ম্ম নিষ্কাম, সে কার মঙ্গল খুঁজিলাম, তত্ত্ব রাখে না। মঙ্গল হইলেই হইল।"

ব্যাপার দেখিয়া রঙ্গরাজ লোক লইয়া যুদ্ধ করিতে আসিল—প্রফুল্ল বলিলেন।—

"একটা মেয়েমানুষের প্রাণের জন্য এত লোক তোমরা মারিবার বাসনা করিয়াছ—তোমাদের কি কিছু ধর্ম্ম-জ্ঞান নাই। আমার পরমায়ু শেষ হইয়া থাকে, আমি একা মরিব—আমার জন্য চারিশ লোক কেন মরিবে? আমায় কি তোমরা এমন অপদার্থ ভাবিয়াছ যে, আমি এত লোকের প্রাণ নষ্ট করিয়া আপনার প্রাণ বাঁচাইব?"

রঙ্গরাজ চলিয়া গেল। নিশি বলিল, "ভাল, তোমার প্রাণ লইয়া তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার, কাহারও নিষেধ করিবার অধিকার নাই। কিন্তু আজ তোমার সঙ্গে তোমার স্বামী—তাঁর জন্যেও ভাবিলে না?"

প্রফুল্ল উত্তর করিল—

"ভাবিয়াছি, ভগিনি! ভাবিয়া কিছু করিতে পারি নাই। জগদীশ্বর মাত্র ভরসা। যা হইবার, হইবে। কিন্তু যাই হউক নিশি—এক কথা সার। আমার স্বামীর প্রাণ বাঁচাইবার জন্য এত লোকের প্রাণ নষ্ট করিবার আমার কোন অধিকার নাই। আমার স্বামী আমার বড় আদরের—তাদের কে?"

তারপরে ভক্তের প্রতি ভগবানের কৃপায়, কিরূপে সকল দিকই বজায় রহিল, তাহা পাঠকবর্গ জ্ঞাত আছেন। ফলতঃ এই দিনকার এই ঘটনায় প্রফুল্লের শিক্ষার ফল তাঁহার অতুলনীয় গুণ রাশি প্রকাশ করিয়া দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে। গ্রন্থকার এই ঘটনায় দেখাইয়াছেন—

(১) প্রফুল্ল বৈকুণ্ঠেশ্বরকে সমস্ত সমর্পণ করিতে অত শিক্ষা অমন চেষ্টা করিয়াও, ব্রজেশ্বরকে ভুলিতে পারিল না। (পারিলে কি হিন্দুশাস্ত্রে পতিযুক্তার সন্ন্যাস নিষেধ থাকিত?)

(২) ভবানী পাঠকের নির্দিষ্ট পথে চলা প্রফুল্লের পক্ষে অসহনীয় হইয়াছিল—সংসারে প্রবেশ করিতে তাহার ইচ্ছা

জন্মিয়াছিল কিন্তু যে পথ রুদ্ধ দেখিয়া মৃত্যু সম্ভাবনা জানিয়া শুনিয়াও প্রফুল্ল প্রথমে মৃত্যু হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিল না। কিন্তু শেষ সংসারে প্রবেশের পথ বিঘ্নশূন্য হইলে, পুনরায় আত্মরক্ষার্থ তাহার কিছু ইচ্ছা হইল।

(৩) প্রফুল্ল যখন নিজের জীবন রক্ষা আবশ্যক মনে করিল, তখনও তজ্জন্য আপনার অধীন লোকজনের অকারণ হত্যা অনর্থক ও পাপজনক বলিয়া মনে করিল।

(৪) প্রফুল্ল স্বামীর প্রাণরক্ষার জন্যও যাহাতে অন্য কাহারও প্রাণনাশের সম্ভাবনা আছে, তাহাতে সম্মত হইল না।

(৫) প্রফুল্ল বুদ্ধিবৃত্তির এমন বিকাশ করিয়াছিল যে, যাহা অন্যের জানিবার সম্ভাবনা নাই, তাহাও সে অনায়াসে বুঝিতে পারিত।

(৬) ভক্তের কাতর প্রার্থনা ভগবান শুনিয়া থাকেন।

এ সকল কথা গ্রন্থেই বড় সুস্পষ্ট আছে, আমরা আর তাহার ব্যাখ্যা করিতে চাহি না।

উপসংহারে প্রফুল্লের পরীক্ষা সমাপ্ত হইল। প্রফুল্ল সন্ন্যাস ছাড়িয়া সংসারে প্রবেশ করিলেন। কেন করিলেন—তাহা তিনি স্বমুখে এইরূপ বুঝাইয়াছেন—

"এই ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম; রাজত্ব স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম নয়। কঠিন ধর্ম্মও এই সংসার ধর্ম্ম। ইহার অপেক্ষা কোন যোগই কঠিন নয়। দেখ, এই এতগুলি নিরক্ষর স্বার্থপর, অনভিজ্ঞ লোক লইয়া আমাদের নিত্য ব্যবহার করিতে হয়। ইহাদের কারও কোন কষ্ট না হয়, সকলে সুখী হয়, সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। এর চেয়ে কোন্ অভ্যাস-কঠিন? এর চেয়ে কোন্ পুণ্য বড় পুণ্য? আমি এই সন্ন্যাস করিব।"

শুন শিক্ষিতা অশিক্ষিতা হিন্দুরমণি! শুন, এই প্রফুল্ল কি বলিতেছে—শুনিয়া শিখ যে সংসার ধর্ম্ম একটা অতি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং সেই ধর্ম্মপালনার্থ অতি উচ্চ শিক্ষারই আবশ্যক।

প্রফুল্ল সংসারে কিরূপ কার্য্য করিতে ছিলেন, নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিয়া পাঠকগণ তাহা বুঝিতে পারিবেন।

"কয়েক মাস থাকিয়া সাগর দেখিল, প্রফুল্ল যাহা বলিয়াছিল, তাহা করিল। সংসারের সকলকে সুখী করিল। শাশুড়ী প্রফুল্ল হইতে এত সুখী যে, প্রফুল্লের হাতে সমস্ত সংসারের ভার দিয়া, তিনি কেবল সাগরের ছেলে কোলে করিয়া বেড়াইতেন। ক্রমে শ্বশুরও প্রফুল্লের গুণ বুঝিলেন শেষ প্রফুল্ল যে কাজ না করিত, সে কাজ তাঁর ভাল লাগিত না। শ্বশুর শাশুড়ী প্রফুল্লকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কোন কাজ করিত না, তাহার বুদ্ধি বিবেচনার উপর তাহাদের এতটাই শ্রদ্ধা হইল। ব্রহ্মঠাকুরাণীও রান্না ঘরের কর্ত্তৃত্ব প্রফুল্লকে ছাড়িয়া দিলেন। বুড়ী আর বড় রাঁধিতে পারে না, তিন বউ রাঁধে; কিন্তু যে দিন প্রফুল্ল দুই খানা না রাঁধিত, সে দিন কাহারও

অন্নব্যঞ্জন ভাল লাগিতনা। যাহার ভোজনের কাছে প্রফুল্ল না দাঁড়াইত, সে মনে করিত, আধপেটা খাইলাম। শেষ নয়ান বৌও বশীভূত হইল। আর প্রফুল্লের সঙ্গে কোন্দল করিতে আসিতনা। বরং প্রফুল্লের পরামর্শ ভিন্ন কোন কাজ করিত না। দেখিল, নয়ন তারার ছেলে গুলিকে প্রফুল্ল যেমন যত্ন করে, নয়নতারা তেমন পারে না। নয়ন তারা প্রফুল্লের হাতে ছেলেগুলি সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। সাগর বাপের বাড়ী অধিক দিন থাকিতে পারিল না—আবার আসিল। প্রফুল্লের কাছে থাকিলে সে যেমন সুখী হইত, এত আর কোথাও হইত না।

"প্রফুল্লের বিষয়বুদ্ধি, বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও সদ্বিবেচনার গুণে, সংসারের বিষয় কর্ম্মও তাহার হাতে আসিল। তালুক মুলুকের কাজ বাহিরে হইত বটে, কিন্তু একটু কিছু বিবেচনার কথা উঠিলে, কর্ত্তা আসিয়া গিন্নিকে বলিতেন, 'নূতন বৌমাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, তিনি কি বলেন?' প্রফুল্লের পরামর্শে সব কাজ হইতে লাগিল বলিয়া দিন দিন লক্ষ্মীশ্রী বাড়িতে লাগিল।"

গ্রন্থকার লিখিলেন—

"এ সকল অন্যের পক্ষে আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু প্রফুল্লের পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। কেন না প্রফুল্ল নিষ্কাম ধর্ম্ম অভ্যাস করিয়াছিল। প্রফুল্ল সংসারে আসিয়াই যথার্থ সন্ন্যাসিনী হইয়াছিল। তার কোন কামনা ছিল না—কেবল কাজ খুঁজিত— কামনা অর্থে আপনার সুখ খোঁজা—কাজ অর্থে পরের সুখ খোঁজা। প্রফুল্ল নিষ্কাম অথচ ধর্ম্মপরায়ণ, তাই প্রফুল্ল যথার্থ সন্ন্যাসিনী। তাই প্রফুল্ল যাহা স্পর্শ করিত, তাই সোণা হইত। প্রফুল্ল ভবানীঠাকুরের শাণিত অস্ত্র— সংসার গ্রন্থি অনায়াসে বিচ্ছিন্ন করিল। অথচ কেহই হরবল্লভের গৃহে জানিতে পারিল না যে, প্রফুল্ল এমন শাণিত অস্ত্র। সে যে অদ্বিতীয় মহামহোপাধ্যায়ের শিষ্যা— নিজে পরম পণ্ডিত,—সে কথা দূরে থাক, কেহ জানিল না, যে তাহার অক্ষর-পরিচয় আছে। গৃহ-ধর্ম্মে বিদ্যা-প্রকাশের প্রয়োজন নাই। গৃহ ধর্ম্ম বিদ্যা-তেই সুসম্পন্ন করিতে পারে বটে, কিন্তু বিদ্যা-প্রকাশের স্থান সে নয়, সেখানে যাহার বিদ্যা প্রকাশ পায়, সেই মূর্খ। যাহার বিদ্যা প্রকাশ পায় না, সেই যথার্থ পণ্ডিত।"

এখানে এই প্রফুল্ল চরিত্র সমাপ্ত করিয়া আমরা আমাদের হিন্দুরমণীগণ সম্বন্ধে কয়েকটা অবান্তর কথা বলিতে চাই।

সংস্কৃত ভাষায় পত্নীর একটি প্রতিশব্দ সহধর্ম্মিণী। বাঙ্গালা ভাষাতেও তাহাই। এই সহধর্ম্মিণী শব্দের অর্থ—যে (পতির) সহ ধর্ম্ম আচরণ করে। পত্নীর অনেক প্রতিশব্দ আছে— স্ত্রী, জায়া, ভার্য্যা, অর্দ্ধাঙ্গিনী ইত্যাদি। এই প্রতিশব্দসমূহের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ অর্থবাচক—পতি পত্নীর বিশেষ সম্বন্ধজ্ঞাপক। অন্যান্য ভাষাতেও পত্নীর এইরূপ বহুতর প্রতিশব্দ আছে। যথা ইংরাজিতে Wife, Better half ইত্যাদি। এই সকল শব্দ বিশ্লেষণ করিয়া আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, ইংরাজী ভাষাতে পত্নীর প্রতিশব্দ গুলি যেন একঘেয়ে—একার্থবাচক, সংস্কৃত ভাষার শব্দ গুলি সেরূপ নহে। ইংরাজী প্রতিশব্দগুলি সবই প্রায় প্রণয়জ্ঞাপক। সংস্কৃতে সেইরূপ

প্রণয়জ্ঞাপক প্রতিশব্দের অভাব নাই সত্য, কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্য উচ্চতর ভাবজ্ঞাপক শব্দও এই ভাষায় আছে। জায়া, সহধর্ম্মিণী প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত। এইরূপ প্রতিশব্দ জগতের অন্য কোন ভাষাতে আছে কি না, জানি না; নাথাকিবার কারণ ত যথেষ্ট আছে। তাহা খুলিয়া বলিতেছি। ধর্ম্মাচরণ সকল জাতিতেই করিতেছে, সকল জাতিতেই করিয়াছে; কিন্তু হিন্দুর ন্যায় ধর্ম্মকে এমন সর্ব্বকার্য্যব্যাপী বুঝি এ পর্য্যন্ত অন্য কোন জাতিতে করে নাই। প্রাচীন জাতির ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না। এখন যে দুইটী প্রবল জাতির সহিত আমাদের সংস্রব রহিয়াছে তাহাদের কথাই বলিব। দেখ ইংরাজ-জাতি। ইহারা কি ধর্ম্মাচরণ করে না? কে বলিবে? স্বার্থত্যাগী পরমযজীবন দীনদয়াল যিশুখৃষ্টের কথা নাই বা বলিলাম, এখনও এমন উদারচেতা পরোপকারী প্রবীণ অনেক খৃষ্টান আছেন, যাঁহাদের ধর্ম্মজীবন দেখিলে, বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। ইহাদিগকে সম্মুখে রাখিয়া, সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন না করিয়া, কে বলিতে পারিবে যে, খৃষ্টানের মধ্যে ধর্ম্মাচারী লোক দেখা যায় না? খৃষ্টানের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল পড়িয়া কে বলিতে পারিবে যে, প্রকৃত, খৃষ্টান ধর্ম্মাচরণ করে না? যেমন খৃষ্টান সম্বন্ধে বলিলাম, মুসলমান সম্বন্ধেও সেইরূপই বলিতে পারি। এই দুই জাতিই সম্মুখে দেখিতেছি, তাই ইহাদের কথাই বলিলাম—মনে হয়, অন্যান্য সব জাতিই এইরূপ ধর্ম্মাচারী।

ইহারা সকলেই ধর্ম্মাচারী সত্য, কিন্তু হিন্দুর ন্যায় নহে। খৃষ্টানের ও মুসলমানের কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে—তাহার সহিত কেবলমাত্র তাঁহাদের ধর্ম্মের সম্বন্ধ—অবশিষ্ট কার্য্যের সহিত তাঁহাদের ধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই। যেমন এই ধর—আহার। খৃষ্টানেরা আহারের সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ রাখা প্রায় উচিত মনে করেন না। তাঁহাদের নিকট আহার, শারীরিক অভাব-নিবারণার্থ—সুখজনক ক্রিয়াবিশেষ। তাঁহারা আহারে এই দুইটী বিষয়ই খুঁজিয়া থাকেন—শরীরের পুষ্টি ও রসনার আনন্দ। মুসলমানেরাও এইরূপ কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ স্বীকার করেন। হিন্দুরা কিন্তু সেরূপ করেন না—অন্ততঃ পূর্ব্বে করিতেন না। তাঁহাদের জীবনের প্রতি খুঁটি-নাটি হইতে বৃহৎ, বৃহত্তর, বৃহত্তম সমস্ত কার্য্যই ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। অন্ততঃ হিন্দুশাস্ত্রের এই আদেশ—এই উপদেশ—এই তাৎপর্য্য। হিন্দুর প্রতি কার্য্যই সেই একাভিমুখী। হিন্দুর ধর্ম্মের সহিত সংস্রব রাখিতে হইবে না, এমন কোন কার্য্যই নাই, থাকিতেও পারে না। অপরাপর জাতি যাহাকে সুখ বলে, হিন্দু তাহাকে সুখ বলে না। হিন্দুর সুখের ধারণা ও সংজ্ঞাও পৃথক্—সেই সুখের ধারণা বা সংজ্ঞা এইরূপ যে, তাহা লাভ করিতে হইলে ধর্ম্মাচরণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। মানুষ সকল কার্য্যেই সুখ চাহে—সুতরাং হিন্দুর সকল কার্য্যেই সেই ধর্ম্মানুষ্ঠান আবশ্যক, কারণ সেই ধর্ম্মের রেখার কণামাত্র অতিক্রম করিলেও হিন্দুর সুখ হওয়া অসম্ভব। তাই হিন্দুর যেমন আহারে, তেমনই বিহারে সেই ধর্ম্মকার্য্যই প্রধান লক্ষ্য হইয়া পড়ে। তাই হিন্দুর বিবাহেও

দাম্পত্য-সুখ বা পতিপত্নীর ইন্দ্রিয়-সুখই মূল লক্ষ্য নহে—এবং হিন্দুপত্নীর প্রধান প্রতিশব্দ হিন্দুজাতিমধ্যে প্রণয়িনী নহে—সহধর্ম্মিণী।

এই "সহধর্ম্মিণী" কথাটিই ভাবিয়া দেখিলে, পূর্ব্বকালের হিন্দুদিগের পতি-পত্নীর সম্বন্ধ সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, হিন্দুজাতির মধ্যেই এই সম্বন্ধটা যেন দিন দিন শিথিল হইয়া যাইতেছে।

হিন্দুর নিকট, গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্মপালনের জন্য আশ্রম বিশেষ। এই "আশ্রম" কথাটাতেই সাংসারিক কার্য্যের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ পরিস্কাররূপে বুঝাইয়া দিতেছে। এই আশ্রমের যাবতীয় কার্য্যই হিন্দুগণ ধর্ম্মোদ্দেশে করিবেন, ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। হিন্দুর আহারের পূর্ব্বে ও পরে যে সকল মন্ত্রোচ্চারণের বিধি আছে—আহারকালে যে প্রকার অবস্থায় থাকিবার ব্যবস্থা আছে, একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে তাহাতেই উপরোক্ত কথাটীর অর্থ বেশ বুঝিতে পারা যায়। যাহা হউক সে সব মন্ত্রের কথার উল্লেখের এখানে প্রয়োজন নাই। এখন ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, হিন্দুর ঘরকন্নাও ধর্ম্মাচরণ। এই ধর্ম্মাচরণে পত্নী পতির সহধর্ম্মিণী। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, এখন আর হিন্দু-পত্নীগণ যেন সে কথা মনেই করেন না। তাঁহারা ঘর-কন্না করিতেছেন, কিন্তু ঘরকন্না যে একটা ধর্ম্ম—যেমন পূজা, সন্ধ্যা, উপাসনা ধর্ম্মা-চরণ—যেমন অতিথিসেবা, দান, ব্রতাদি ধর্ম্মাচরণ, ঘরকন্নাও যে ঠিক্ তেমনই একটা ধর্ম্ম—একথা বর্ত্তমান কালের হিন্দুপত্নীগণ যেন ভুলিয়া যাইতেছেন। এই ভয়ানক ভুল হইতেই সমাজে স্ত্রীজাতির এখন অবনতি হইতেছে, আমরা এইরূপ মনে করি। কেন করি, তাহা বলিতেছি।

দেখ হিন্দুপত্নী যাহাকে ধর্ম্মাচরণ মনে করে—তাহা কত সাবধানে, কত যত্নে, কত শঙ্কিতচিত্তে করিয়া থাকে। হিন্দুর পূজার ঘর, পূজার সজ্জা—কেমন পবিত্র, কেমন সুন্দর!

এই পূজা উপাসনার সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে বুঝিয়াই হিন্দুপত্নী এমন পবিত্রচিত্তে, এমন পবিত্রশরীরে, এমন সযত্নে, এমন সাবধানে, এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু যেটা 'ঘর-কন্না'—তাহাতে হিন্দুপত্নী ত এমন পবিত্র হৃদয়, পবিত্র কায়ের আবশ্যকতা মনে করেন না। তাই ইহাতে এত শৈথিল্য, এত অশান্তি, এত কলহ, এত পদস্খলন। তাঁহারা মনে করেন ঘরকন্নাটা না করিলে শরীর চলে না—সংসার চলে না, তাই তাহা অনুষ্ঠেয়। তাঁহারা "ঘরকন্না"ই ধর্ম্মানুষ্ঠান—তাহাই সুখের উপায়, তাহাই প্রকৃত সুখ, এরূপ আর মনে করেন না। তাঁহারা ঘরকন্না করিয়া শরীর বাঁচাইয়া অন্য উপায়ে সুখলাভ করিতে চাহেন। তাই হিন্দুর গৃহে এখন আর সে পবিত্রতা নাই, সে নিঃস্বার্থপরতার উজ্জ্বল উদাহরণ নাই। সে শান্তি নাই, সে সুখও নাই।

বাস্তবিক এখন আর হিন্দুপত্নীকে প্রকৃত প্রস্তাবে "সহধর্ম্মিণী" বলা যায় না। তাঁহারা এখন প্রণয়িনী মাত্র। তাঁহারা নিজেরাও তাহাই ভাবেন। স্বামীর ধর্ম্মাধর্ম্মে, ছোট বড় সকল কার্য্যে, কোন্ হিন্দু পত্নী দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন?

স্বামীর কি অনুষ্ঠেয় কি অনুষ্ঠেয় নহে, স্বামীর ধর্ম্মাচরণে সহায়তা করিতে—কি কর্ত্তব্য, কি নহে—কোন্ পত্নী এখন তাহার সন্ধান রাখিয়া থাকেন? তাঁহারা অনুসন্ধান রাখেন একটা বিষয়ের—চাহেনও সেই একটা বিষয়। তাঁহারা পাইতেও চাহেন কেবলমাত্র স্বামীর ভালবাসা, দিতেও চাহেন তাহাই। সে ভালবাসার অর্থ অনেক সময়ে, দুটো মিষ্ট কথা আর দুটো আবদার মাত্র। কিন্তু এই কুহকিনীই তাঁহাদিগের যেন একমাত্র আরাধ্য দেবতা। এ "ভালবাসা"টা যে কি, তাহা তাঁহারা দেখেন না, দেখিতে পারেন না, দেখিতে চাহেনও না। এ ভালবাসা যে অনেকস্থলেই শতকরা নিরনব্বইটা ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়-সুখ-মোহ কি এমনই একটা কিছু, তাহা তাঁহারা বুঝেন না। না বুঝিয়া এই নিদারুণ হলাহল পান করিয়া, তাঁহারা নিজেরা বিকৃত হইতেছেন—পতিদিগকেও বিকৃত করিয়া তুলিতেছেন।

কেন এমন হইল, জানি না। পাশ্চাত্য প্রণয়ের আপাত মধুর কাহিনী পড়া পতির নিকট হইতেই কি "ভালবাসা" পদার্থটা এমন ভাবে হিন্দুগৃহে স্থান পাইয়াছে? জানি না। কিন্তু ইহা এমন হইয়াছে—ইহা হিন্দুপতিপত্নীর অস্থিমজ্জার সহিত এমনই মিশিয়া পড়িয়াছে যে, বুঝি এই বৃত্তিটার পরিতৃপ্তিই এখন হিন্দুদম্পতীর একমাত্র এবং অতিমাত্র সুখ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। বাঙ্গালাভাষায় লিখিত নবেল, নাটকগুলি এই ভাব পরিপোষণের সহায়তা করিতেছে। যে নবেল লেখে, সেই এই ভালবাসার কাহিনী লইয়া লেখে। সেই কাহিনী যে গ্রন্থে ভাল আছে, সেই গ্রন্থই ভাল। কুন্দ, আয়েসা যত লোকের মনে ধরে, শান্তি প্রফুল্ল তত তাহাদের মনে ধরে না। এমনই অধঃপতন ঘটিতেছে।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মর্ম্মাহত হইতেছি। কাহার দিকেই বা তাকাই? সমাজে যাঁহারা শিক্ষিতা বলিয়া খ্যাতা, তাঁহারা ত এই ভালবাসার অধিকার লইয়াই ব্যতিব্যস্ত—তাঁহারা কি আর ইহজন্মে সহধর্ম্মিণী হইতে চাহিবেন? "ঘরকন্না" তাঁহাদিগের নিকট অতি ক্ষুদ্র কার্য্য। ইহা ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ত নহেই, প্রত্যুত অতি ঘৃণাজনক হীনকার্য্য বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। তাঁহারা চাহেন উচ্চ বিষয়ের দিকে—রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বড় বড় কার্য্য লইয়া তাঁহারা ব্যস্ত—তাঁহারা কি ঘরকন্নার কথা ভাবিতে পারেন? আর যাঁহারা অশিক্ষিতা, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে ঘরকন্না করেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহা একটা অতি পবিত্র কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মানুষ্ঠান ভাবিয়া নহে—না করিলে চলে না বলিয়া। যেমন উপাসনা, যেমন পূজা, যেমন ব্রত, যেমন যজ্ঞ, তেমনই যে "ঘরকন্না" একথা তাঁহারা জানেনই না। তাই এখন আর আমাদিগের গৃহস্থাশ্রম নাই। আছে যাহা, তাহা আহার-বিহারের নির্দ্দিষ্ট স্থানমাত্র। গৃহস্থাশ্রমে এখন আর সহধর্ম্মিণী নাই—আছে প্রণয়িনী মাত্র।

তাই আমাদের বড় ইচ্ছা হয়, এই হিন্দুপত্নীগণকে আবার সেই গৃহধর্ম্মে সহধর্ম্মিণী পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিব। ঘরকন্না যে একটা বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠান, তাহা বুঝিয়া যদি শিক্ষিতা কামিনীগণ "সহধর্ম্মিণীর"

ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন,তবে আবার আমাদিগের এই গৃহস্থাশ্রমে চতুর্ব্বর্গের ফল পাইতে পারি। হায়! কবে এই আশা সফল হইবে? কবে হিন্দু-রমণী আবার সেই "সহধর্ম্মিণীর" উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া প্রফুল্লের ন্যায় স্বামীর ছোট বড় সকল অনুষ্ঠানে সহায়তা করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবেন? এমন দিন কি হইবে?

অন্যান্য চরিতাবলী।

১। ভবানী পাঠক—

গুরুত্বে প্রফুল্ল-চরিত্রের নীচেই এই চরিত্র স্থান পাইতে পারে। ভবানী পাঠক পণ্ডিত—এত বড় পণ্ডিত যে স্বয়ং প্রফুল্ল দেবী ইহাকে বলিয়াছেন—"আপনি মহামহোপাধ্যায়—আপনাকে আমি তর্কে আঁটিয়া উঠিতে পারিব না।"

আর প্রফুল্লের সার্টিফিকেট দিয়াই বা ভবানী-পাঠককে চিনাইতে হইবে কেন? ভবানী পাঠকের কার্য্যেই তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় প্রকাশিত আছে।

এই ব্রাহ্মণকে আমরা প্রথমে দেখি-লাম—গায়ে নামাবলি, কপালে ফোঁটা, মাথা কামান। ব্রাহ্মণ দেখিতে গৌরবর্ণ, অতিশয় সুপুরুষ—বয়স বড় বেশী নয়। প্রফুল্লের সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ প্রফুল্লকে বলিলেন, তাঁহার এক দোকান আছে। প্রফুল্ল বলিলেন 'কিন্তু আপনাকে ত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মত দেখিতেছি।' এ কথায় ভবানী উত্তর করিলেন—

'ব্রাহ্মণপণ্ডিত অনেক রকমের আছে। বাছা। তুমি আমার সঙ্গে এসো।' ভবানী পাঠক সেই অনেক রকমের ব্রাহ্মণপণ্ডিত-মধ্যে এক রকমের ব্রাহ্মণপণ্ডিতই বটে।

ভবানী পাঠক শুদ্ধ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত নহেন। তিনি একজন অদ্বিতীয় কর্ম্মবীর। দেখ তিনি একস্থলে বলিয়া-ছেন—'এ দেশে রাজা নাই। মুসলমান লোপ হইয়াছে। ইংরেজ সম্প্রতি ঢুকি-তেছে—তাহারা রাজ্য পালন করিতে জানেও না, করেও না। আমি দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করি। বড় সহজ কর্ম্ম নহে এ—বড় সহজ বীর নহে এই ভবানী পাঠক। যেমন সঙ্কল্প তেমনই চেষ্টা—সিদ্ধিও তদনুরূপ। কবি লিখিয়াছেন—

"ইংরাজ রাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ করিল। রাজ্য সুশাসিত হইল। সুতরাং ভবানী ঠাকুরের কাজ ফুরাইল। দুষ্টের দমন রাজাই করিতে লাগিল। ভবানী-ঠাকুর ডাকাইতি বন্ধ করিল।

"তখন ভবানীঠাকুর মনে করিল 'আমার প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন।' এই ভাবিয়া ভবানীঠাকুর ইংরেজকে ধরা দিলেন, সকল ডাকাইতি একবার করি-লেন, দণ্ডের প্রার্থনা করিলেন। ইংরেজ হুকুম দিল, 'যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে বাস।' ভবানীপাঠক প্রফুল্ল চিত্তে দ্বীপান্তরে গেল।"

যেমন ভক্ত সত্যানন্দের, তেমন এই জ্ঞানী ভবানীপাঠকের চরিত্র। এই চরিত্রে কবির ইঙ্গিত ব্যাখ্যা করিবার জো নাই। তিনি দেখাইয়াছেন—এ চরিত্র আদর্শ-শিক্ষা প্রাপ্ত। কিন্তু তবু তাহাতে অতি-সূক্ষ্ম দোষের কটাক্ষ করিয়াছেন; কেন করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে দুইপ্রকার মত আমরা সত্যানন্দ চরিত্র সমালোচনাকালে

পাঠকবর্গকে বলিয়াছি। আর অতিরিক্ত কিছুই বলিতে চাহি না।

২। ব্রজেশ্বর—

বর্ত্তমান সময়ে নভেলগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, একমাত্র স্ত্রীপুরুষঘটিত প্রণয়ই এই নভেলগুলির প্রধান বিষয়। হৃদয়ের অন্যান্য বৃত্তি যথা ভ্রাতৃস্নেহ, পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, প্রভৃতি বৃত্তির বিকাশ কোন নভেলে তাদৃশ অঙ্কিত হয় না। আমাদিগের মহাকবির প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের উপন্যাস গুলিও এ অভিযোগমুক্ত নহে। তবে তাঁহার তৃতীয় স্তরের উপন্যাসের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ কেহ আনিতে পারে না। কারণ এ স্তরের উপন্যাসে তিনি মানুষের সমগ্র কর্ত্তব্যই কাব্যের বিষয় করিয়া দেখাইয়াছেন—তাহাতে এ বৃত্তি, সে বৃত্তি পৃথক্ ভাবে না বলিলেও চলে।

যাহাহউক, ব্রজেশ্বর চরিত্রে সেই স্ত্রীপুরুষের প্রণয়-বৃত্তি ভিন্ন আর একটী বৃত্তির বিকাশ কবি দেখাইয়াছেন। সেটি তাহার পিতৃভক্তি। ব্রজেশ্বর প্রকৃতই পিতৃভক্ত পুরুষ।

ব্রজেশ্বরের পিতা হরবল্লভ ভাল লোক ছিলেন না। তিনি ভাল লোক থাকিলে, তৎপ্রতি ব্রজেশ্বরের ভক্তিতে আমরা পিতৃভক্তির দৃষ্টান্ত এমন দেখিতে পাইতাম না। যাহাকে অন্য সকলেও ভক্তি করিতে পারে, তাহাকে পুত্র ভক্তি করিলে, সে ভক্তি পিতৃভক্তি বলিয়া পৃথক্‌রূপে ব্যাখ্যা না হইলেও পারে। কিন্তু যে অন্যের ভক্তির পাত্র নহে, তাহাকে পুত্র ভক্তি করিলে, তাহাতেই পিতৃভক্তির বিকাশ ভাল প্রত্যক্ষ হয়। তাই ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তি কিছু বেশী ফুটিয়াছে।

পূর্ব্বে অনেক স্থলেই আমরা বলিয়াছি, কোন বৃত্তির পরিমাণ করিতে হইলে, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী বৃত্তি বা তৎবিকাশের বিরোধী অবস্থা দ্বারাই তাহার পরিমাণ হইয়া থাকে। ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তির বিরোধী বৃত্তি তাহার পত্নীপ্রেম। বড় সহজ নহে এ সংঘর্ষণ।

এ সংঘর্ষণে সচরাচর কি হইয়া থাকে, সকলেই দেখিতেছেন, কিন্তু পিতৃভক্ত ব্রজেশ্বর তাহাতে কিছু মাত্র টলিল না। সে পিতার কথায় বিনা দোষে অমন প্রফুল্লকে পরিত্যাগ করিল—পিতার অসন্তুষ্ট-ভয়ে মৃত্যু স্বীকার করিয়াও প্রফুল্লকে আনিবার কথা প্রকাশ করিল না। পিতার জন্য প্রফুল্লকে বলিল—"তুমি মরিলে, আমার মরার অধিক হইবে, কিন্তু আমি দেখিতে আসিব না। তোমার আত্মরক্ষার আগে আমার ছার প্রাণ রাখিবার আগে, আমার পিতাকে রক্ষা করিতে হইবে।" পিতা যতই অসৎকার্য্য করিতেন, ততই যেন ব্রজেশ্বর জোর করিয়া অভ্যাস করিতে লাগিলেন—

"পিতা ধর্ম্ম পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমন্তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ।"

এ পিতৃভক্তি আধুনিক যুবকগণের দেখিবার বিষয় বটে।

৩। সাগর—

কাব্য সমালোচনা করিতে গিয়া এই সাগরের সৌন্দর্য্য সবিশেষ প্রদর্শন না করিলে কর্ত্তব্য কার্য্যে ত্রুটি হয়। অথচ আমরা মহাকবির এই শেষের স্তরের উপন্যাস সমালোচনায় এইরূপ চরিত্রের

বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিতে বিশেষ প্রস্তুত নহি। প্রস্তুত নহি, কারণ ইহাতে আমাদিগের আর সে রুচি নাই সুতরাং সে ক্ষমতা নাই। যে সময়ে সূর্য্যমুখী, ভ্রমর, কমলমণি, দলনী প্রভৃতি চরিত্র আলোচনা করিয়াছিলাম, বুঝি তখন এইরূপ চরিত্র পাইলে বিস্তৃত আলোচনা করিতে পারিতাম। কিন্তু এখন আর তাহা পারিয়া উঠিতেছি না। এই যে আমাদিগের অসামর্থ্য, ইহাতেও কবির ক্ষমতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আমরা সমালোচক হইয়া, শান্তি, শ্রী, প্রফুল্ল, সীতারাম, সত্যানন্দ প্রভৃতি চরিত্র সঙ্গে এই সাগরের চরিত্র বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিতে আমাদিগকে অক্ষম মনে করিলাম, কবি কিন্তু এক আসনে বসিয়া এক তুলিতে এই বিভিন্ন চিত্র অঙ্কিত করিতেও সমর্থ হইয়াছেন!

সাগরের অনন্ত সৌন্দর্য্য বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ হইলেও তাহার দুই একটা ঊর্ম্মির খেলা না দেখাইলে যুবা পাঠকবৃন্দের নিকট লজ্জিত হইতে হয়। তাই সাগরের সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিতেছি।

সাগর ভ্রমর জাতীয়া রমণী। ঠিক তেমনই ছোট, তেমনই প্রেমিকা—তেমনই বুদ্ধিমতী, তেমনই রসিকা। ভ্রমর-চরিত্রের যেটুকু কলঙ্ক—যে দুর্জ্জয় অভিমান, তাহাও সাগরের চরিত্রে যে না দেখিতে পাই এমন নহে। সেই যে দিন সাগর ব্রজেশ্বরের পায় পড়িয়া তাহার ক্রোধ নিবারণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল, যে দিন ব্রজেশ্বর রাগে পা টানিয়া লইতে, সেই পা একটু জোরে সাগরের গায়ে লাগিয়াছিল—সেই দিন সাগর স্বামীর পা ছাড়িয়া দিয়া কুপিত ফণিনীর ন্যায় বলিল—

"কি আমায় নাথি মারিলে?

"ব্রজেশ্বর। যদি মারিয়াই থাকি? তুমি না হয় বড় মানুষের মেয়ে, কিন্তু পা আমার—তোমার বড় মানুষ বাপও এ পা একদিন পূজা করিয়াছিলেন।"

সাগর বলিল—"ঝকমারি করিয়াছিলেন। আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করিব।"

এ ডেমাক বড় কাব্যময়। ইহার বিশ্লেষণ বড় সহজ ব্যাপার নহে।

তা' সাগর অভিমানী থাকুক, আর যাহাই থাকুক, তাহাকে সহজে ভুলা যায় না। বড়ই মনোহর, বড়ই নয়নরঞ্জন এই চিত্র। সাগরের পতিপ্রেমের কথা নাই বা বলিলাম—সাগরের আর যাহা দেখিয়াছি, তাহাতেই তাহাকে ভুলিতে পারা যায় না। সাগরের সেই সর্ব্বব্যাপী স্নেহ—সেই প্রফুল্ল-প্রতি প্রকৃত ভগিনীবৎ ভালবাসা সংসারে বড় দুর্লভ জিনিস। এ স্নেহের পরিচয় আমাদিগের মহাকবির গ্রন্থেও বুঝি এমন আর নাই। ফলতঃ এই সাগরের এক তীরে সেই কাপালিক-প্রতিপালিতা কপালকুণ্ডলা—অন্যতীরে সেই পতিস্নেহপালিতা ভ্রমরকে দেখিতে পাই। যাহার দুই তীরে এমন দুইটি প্রসিদ্ধ চিত্র—তাহার কি বর্ণনা লিখিব!

৪। নিশা—

নিশা আজীবন কুমারী বা পতিসম্বন্ধরহিতা সন্ন্যাসিনীর চিত্র। পতিযুক্তা, সন্ন্যাসধর্ম্মগ্রহণে উদ্যতা প্রফুল্লের পার্শ্বে ইহার সমাবেশ বড়ই সুন্দর হইয়াছে। সীতারামে যেমন শ্রী ও জয়ন্তী, তেমন এই গ্রন্থে এই নিশা ও প্রফুল্ল।

নিশা জয়ন্তীতে বিশেষ প্রভেদ নাই প্রভেদ যা, তাহা এই শ্রীতে ও জয়-

স্ত্রীতে। নিশার সেই কথা—"ও সকল মেয়েমানুষের নহে। যদি মেয়েকে ও পথে যাইতে হয়, তবে আমার মত হইতে হইবে। আমাকে কাঁদাইবার জন্য ব্রজেশ্বর নাই। আমার ব্রজেশ্বর বৈকুণ্ঠেশ্বর একই"—এই নিশার চরিত্র ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছে। ফলতঃ এই নিশা ও জয়ন্তী সন্ন্যাসিনীর আদর্শ চিত্র।

অন্যান্য চরিত্র সম্বন্ধে কিছু বলার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

ভাষা—বর্ণনা—ঘটনা।

ভাষা

উপন্যাসে নানাবিধ কার্য্যে নানাপ্রকার ভাষা ব্যবহার করিতে হয়। চরিত্রের কথোপকথনে একরূপ—গ্রন্থকারের উপাখ্যান-বর্ণনে অন্যরূপ। মন্তব্য লিখনে একরূপ—উচ্ছ্বাসবর্ণনে অন্যরূপ। বলা বাহুল্য যে, আমাদিগের মহাকবির এ সকল ভাষাতেই বিশেষ অধিকার ছিল। দেবীচৌধুরাণী উপন্যাসে কথোপকথনই বেশী এবং এই কথোপকথনের ভাষা পাঠ করিলে কবির ক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

এই কথোপকথনগুলি অত্যন্ত সরস, অতি সংক্ষিপ্ত, অথচ বহুভাবযুক্ত। লেখকের লেখনী যেন নির্ভয়ে যদৃচ্ছা লিখিয়া গিয়াছে—এবং তাহাতেই যেন এমন সুন্দর, এমন মার্জ্জিত লিপিকৌশল ফুটিয়াছে। দেবীচৌধুরাণীর আরম্ভ হইতেই দেখ। এখন অনেক উপন্যাসে এই ক্রমই আরম্ভ দেখিতে পাই—কিন্তু ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা কোন উপন্যাসে এমন আরম্ভ দেখিয়াছ কি? দেবীচৌধুরাণী উপন্যাসে কথোপকথনের ভাষা যেন সৌন্দর্য্যের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। যাহার কথোপকথনই পাঠ করা যায়—কি প্রফুল্ল ও তাহার মাতার, কি হরবল্লভ ও তাহার পত্নীর, কি সাগর ও নয়ানের, কি ব্রজেশ্বর ও ব্রহ্মঠাকুরাণীর, কি নিশি ও প্রফুল্লের, কি সাগর ও ব্রজেশ্বরের—সর্ব্বত্রই মহাকবির নির্ভয় ও মাজ্জিত লিপিকার্য্য দেখিয়া নিতান্তই বিস্মিত হইতে হয়। আবার এই ভাষা যেন সর্ব্বত্র হাস্যমাখা। ভাষার ভিতর হইতে যেন মহাকবির প্রতিভার জ্যোতি বিকিরণ হইতেছে। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধিভয়ে পাঠকবর্গকে কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারিলাম না। তা নাই বা দেখাইলাম, আমাদিগের কথাগুলি শুনিয়া পাঠকবর্গ পুস্তক খুলিয়া দেখুন, আমাদিগের বর্ণিত গুণ অপেক্ষা সে ভাষায় শত সহস্র অধিকতর গুণ দেখিতে পাইবেন।

বর্ণনা

দেবীচৌধুরাণীতে বোধ হয় একটী-মাত্র প্রকৃতি বর্ণনা আছে। তাহা এই—

"বর্ষাকাল। রাত্রি জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না এমন বড় উজ্জ্বল নয়, বড় মধুর, একটু অন্ধকারমাখা—পৃথিবীর স্বপ্নময় আবরণের মত। ত্রিস্রোতা নদী বর্ষাকালের জলপ্লাবনে, কূলে কূলে পরিপূর্ণ। চন্দ্রের কিরণ সেই তীব্রগতি নদীজলের স্রোতের উপর,—স্রোতে, আবর্ত্তে কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে, জ্বলিতেছে। কোথাও জল

একটু ফুটিয়া উঠিতেছে—সেখানে একটু চিকিমিকি; কোথাও চরে ঠেকিয়া ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গ হইতেছে, সেখানে একটু ঝিকিমিকি। তীরে, গাছের গোড়ায় জল আসিয়া লাগিয়াছে—গাছের ছায়া পড়িয়া সেখানে জল বড় অন্ধকার; অন্ধকারে গাছের ফুল, ফল, পাতা বহিয়া, তীব্র স্রোত চলিতেছে; তীরে ঠেকিয়া জল একটু তর তর কল কল পত পত শব্দ করিতেছে—কিন্তু সে আঁধারে আঁধারে। আঁধারে আঁধারে সেই বিশাল জলধারা সমুদ্রানুসন্ধানে পক্ষিণীর বেগে ছুটিয়াছে। কূলে কূলে অসংখ্য কল কল শব্দ, আবর্ত্তের ঘোর গর্জ্জন, প্রতিহত স্রোতের তেমনি গর্জ্জন; সর্ব্বশুদ্ধ, একটা গম্ভীর গগনব্যাপী শব্দ উঠিতেছে।

"সেই ত্রিস্রোতার উপরে কূলের অনতিদূরে একখানি বজরা বাঁধা আছে। বজরার অনতিদূরে, একটা বড় তেঁতুল গাছের ছায়ায়, অন্ধকারে আর একখানি নৌকা আছে—তাহার কথা পরে বলিব, আগে বজরার কথা বলি। বজরাখানি নানাবর্ণে চিত্রিত; তাহাতে কত রকম মূরদ আঁকা আছে। তাহার পিতলের হাতল দাণ্ডা প্রভৃতিতে রূপার গিলটি। গলুইয়ে একটা হাঙ্গরের মুখ—সেটাও গিলটি করা। সর্ব্বত্র পরিষ্কার—পরিচ্ছন্ন, উজ্জ্বল, আবার নিস্তব্ধ। নাবিকেরা এক পাশে বাঁশের উপর পাল ঢাকা দিয়া শুইয়া আছে; কেহ জাগিয়া থাকার চিহ্ন নাই। কেবল বজরার ছাদের উপর—একজন মানুষ। অপূর্ব্ব দৃশ্য।

"ছাদের উপর একখানি ছোট গালিচা পাতা। গালিচাখানি চারি আঙ্গুল পুরু—বড় কোমল, নানাবিধ চিত্রে চিত্রিত। গালিচার উপর বসিয়া একজন স্ত্রীলোক। তাহার বয়স অনুমান করা ভার—পঁচিশ বৎসরের নীচে তেমন পূর্ণায়ত দেহ দেখা যায় না; পঁচিশ বৎসরের উপর তেমন যৌবনের লাবণ্য কোথাও পাওয়া যায় না। বয়স যাই হউক—সে স্ত্রীলোক পরম সুন্দরী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এ সুন্দরী কৃশাঙ্গী নহে—অথচ স্থূলাঙ্গী নহে—অথচ স্থূলাঙ্গী বলিলেই ইহার নিন্দা হইবে। বস্তুতঃ ইহার অবয়ব সর্ব্বত্র ষোল কলা সম্পূর্ণ—আজি ত্রিস্রোতা যেমন কূলে কূলে পূরিয়াছে—ইহারও শরীর তেমনই কূলে কূলে পূরিয়াছে। তার উপর বিলক্ষণ উন্নত দেহ। দেহ তেমন উন্নত বলিয়াই, স্থূলাঙ্গী বলিতে পারিলাম না। যৌবন-বর্ষার চারি পোয়া বন্যার জল, সে কমনীয় আধারে ধরিয়াছে—ছাপায় নাই। কিন্তু জল কূলে কূলে পূরিয়া টল টল করিতেছে—অস্থির হইয়াছে। জল অস্থির, কিন্তু নদী অস্থির নহে; নিস্তরঙ্গ। লাবণ্য চঞ্চল, কিন্তু সে লাবণ্যময়ী চঞ্চলা নহে—নির্ব্বিকার। সে শান্ত গম্ভীর, মধুর, অথচ আনন্দময়ী; সেই জ্যোৎস্নাময়ী নদীর অনুসঙ্গিনী। সেই নদীর মত, সেই সুন্দরীও বড় সুসজ্জিতা। এখন ঢাকাই কাপড়ের তত মর্য্যাদা নাই—কিন্তু একশত বৎসরের আগে কাপড়ও ভাল হইত, উপযুক্ত মর্য্যাদাও ছিল। ইহার পরিধানে একখানি পরিষ্কার মিহি

ঢাকাই, তাতে জরির ফুল। তাহার ভিতর হীরামুক্তা-খচিত কাঁচুলি ঝক্‌মক্‌ করিতেছে। হীরা, পান্না, মতি, সোনায় সেই পরিপূর্ণা দেহ মণ্ডিত; জ্যোৎস্নার আলোকে বড় ঝক্‌মক্‌ করিতেছে। নদীর জলে যেমন চিকিমিকি—এই শরীরেও তাই। জ্যোৎস্নাপুলকিত স্থির নদীজলের মত—সেই শুভ্র বসন; আর জলে মাঝে মাঝে যেমন জ্যোৎস্নার চিকিমিকি চিকিমিকি—শুভ্র বসনের মাঝে মাঝে তেমনি হীরা, মুক্তা, মতির চিকিমিকি। আবার নদীর যেমন তীরবর্ত্তী বনচ্ছায়া, ইহারও তেমনি, অন্ধকার কেশরাশি আলুলায়িত হইয়া অঙ্গের উপর পড়িয়াছে। কোঁকড়াইয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, ফিরিয়া ফিরিয়া, গোছায় গোছায় কেশ, পৃষ্ঠে, অংসে, বাহুতে, বক্ষে পড়িয়াছে; তার মসৃণ কোমল প্রভার উপর চাঁদের আলো খেলা করিতেছে; তাহার সুগন্ধি চূর্ণ গন্ধে গগন পরিপূরিত হইয়াছে। এক ছড়া যুঁই ফুলের গড়ে সেই কেশরাজি সম্বেষ্টন করিতেছে।

"ছাদের উপর গালিচা পাতিয়া, সেই বহুরত্নমণ্ডিতা রূপবতী মূর্ত্তিমতী সরস্বতীর ন্যায় বীণা-বাদনে নিযুক্তা। চন্দ্রের আলোয় জ্যোৎস্নার মত বর্ণ মিশিয়াছে; তাহার সঙ্গে সেই মৃদুমধুর বীণের ধ্বনিও মিশিতেছে—যেমন জলে জলে চন্দ্রের কিরণ খেলিতেছে, যেমন এ সুন্দরীর অলঙ্কারে চাঁদের আলো খেলিতেছে, এ বন্যকুসুম সুগন্ধি কৌমুদীস্নাত বায়ুস্তর সকলে সেই বীণের শব্দ তেমনি খেলিতেছিল। ঝম্ ঝম্ ছন্ ছন্ ঝনন্ ঝনন্ ছনন্‌ছনন্ দম্ দম্ দ্রিম্ দ্রিম্ বলিয়া বীণে কত কি বাজিতেছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না। বীণা কখন কাঁদে, কখন রাগিয়া উঠে, কখন নাচে, কখন আদর করে, কখন গর্জ্জিয়া উঠে,—বাজিয়ে টিপি টিপি হাসে। ঝিঁঝিট, খাম্বাজ, সিন্ধু—কত মিঠে রাগিণী বাজিল—কেদার হাম্বীর, বেহাগ—কত গম্ভীর রাগিণী বাজিল—কানাড়া, সাহানা, বাগীশ্বরী কত জাঁকাল রাগিণী বাজিল। নাদ কুসুমের মালার মত নদী-কল্লোল-স্রোতে ভাসিয়া গেল। তার পর দুই একটি পরদা উঠাইয়া নামাইয়া লইয়া, সহসা নূতন উৎসাহে উন্মুখী হইয়া, সে বিম্বাবতী ঝন্ ঝন্ করিয়া বীণের তারে বড় বড় ঘা দিল। কানের পিপুলপাত দুলিয়া উঠিল—মাথায় সাপের মত চুলের গোছা সব নড়িয়া উঠিল—বীণে নট রাগিণী বাজিতে লাগিল। তখন যাহারা পাল মুড়ি দিয়া এক প্রান্তে নিঃশব্দে নিদ্রিতবৎ শুইয়াছিল, তাহার মধ্যে একজন উঠিয়া আসিয়া নিঃশব্দে সুন্দরীর নিকট দাঁড়াইল।"

এই বর্ণনাটিকে আমি একটি অত্যুৎকৃষ্ট খণ্ডকবিতা বলিয়া মনে করি। এই-

রূপ বর্ণনায় কবিকে অনায়াসে ধরা যায়। বঙ্গের সহস্র সহস্র কৃতী পুরুষের বর্ণনাগুলি বাছিয়া বাছিয়া একস্থানে কর, তাহার মধ্যে এই বর্ণনাটি ফেলিয়া দেও, অনায়াসে মহাকবির এই বর্ণনা চিনিয়া বাহির করা যাইবে। ভাষাতেও কবিকে ধরা যায়—কিন্তু আজ কাল ইহার এমন রমণীয় অনুকরণ দুই এক স্থানে দেখা যায় যে, একথা বলিতে তেমন সাহস হয় না। তবে এরূপ বর্ণনা দেখিয়া কবিকে ধরিতে কোন রকমই সঙ্কোচ হয় না।

এই বর্ণনার যে কত গুণ, শতমুখেও তাহা ব্যাখ্যা করা যায় না। বর্ণনার শরীর ভাষা—সে ভাষার কথা ত পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রাণ—দৃষ্টি, অলঙ্কার—উপমা। এই বর্ণনায় দুই তিন প্রকারে কবির দৃষ্টি পড়িয়াছে। এক, সেই নির্জ্জীব প্রকৃতির শোভায়। দুই, সেই নির্জ্জীব প্রকৃতির শোভার সহিত, সেই সজীব প্রকৃতি প্রফুল্লের শোভা-সাদৃশ্যে। এই দুইটি বড় পরিষ্কার—পরিষ্কার তবু সুন্দর। একটু প্রচ্ছন্ন থাকিলে যেন আরও কত সুন্দর হইত। কিন্তু কবি তাহা করেন নাই। আমাদিগের উদ্ধৃত অংশের বৃহত্তর অক্ষরে যাহা মুদ্রিত হইয়াছে, পাঠকবর্গ তাহাতেই দেখিতে পাইবেন, সে সাদৃশ্য কবি খুলিয়াই দেখাইয়াছেন। এ সাদৃশ্য তিনি এইরূপে যে খুলিয়া দেখাইয়াছেন, তাহার কারণ আছে। তিনি ইহা খুলিয়া দেখাইয়া আর একটী সৌন্দর্য্য অধিকতর প্রচ্ছন্ন করিয়াছেন। সেইটি বর্ণনার প্রতি তাহার তৃতীয় প্রকারের দৃষ্টি। প্রফুল্লের বহিঃসৌন্দর্য্য, প্রকৃতির বাহিরের শোভার সহিত—প্রফুল্লের মনের শোভার—তাহার মনের ভাবের কি অপূর্ব্ব সম্বন্ধই রহিয়াছে! সেই কথাটি একস্থলে গ্রন্থকার একটু মাত্র ইঙ্গিতে দেখাইয়াছেন, কিন্তু পরিষ্কার বলেন নাই; আমরা তাহা একটু পরিষ্কার করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি।

প্রফুল্লের সেই দিনকার অবস্থা কিরূপ ছিল, পাঠকগণ একবার কল্পনা করিয়া দেখুন। আজ দশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রফুল্ল স্বামীকে দেখিতে পায় নাই—এই দশ বৎসর পূর্ব্বেও স্বামীকে প্রফুল্ল বেশী দিন দেখে নাই। এ জীবনে স্বামীর সহিত আলাপ সেই এক দিন—সেই এক দিনের পরেও আজ দশ বৎসর অতীত হইয়াছে। স্বামীর বিরহ স্ত্রীর নিকট একদিনে এক বৎসর—সেই হিসাবে প্রফুল্লের এই স্বামি-বিরহ আজি কত যুগযুগান্তরের ভাবিয়া দেখুন। প্রফুল্লের সেই স্মৃতি, সেই স্বামি-স্মৃতি, সেই স্বামীর সহিত মিলনের স্মৃতি, ঠিক ঐ জ্যোৎস্নার ন্যায় নয় কি? ঠিক তেমনই মধুর, তেমনই মৃদু উজ্জ্বল, তেমনই অন্ধকারমাখা নয় কি? ঠিক তেমনই স্বপ্নময় নয় কি? বিস্মৃতির আঁধারে মিশিয়া সেই সুখস্মৃতি, অদ্যকার এই চন্দ্রকিরণ যেমন পৃথিবীর উপর পতিত হইয়াছে, তেমনই তাহার হৃদয়োপরি স্বপ্নময় আবরণের মত পড়িয়াছিল নয় কি?

তার পরে, আজ আবার সেই বহুদিন পরে স্বামি-সন্দর্শন হইবে। এত দিন বিরহ-নিদাঘে সেই স্বামি-মিলনাশা ক্ষীণ হইতেও ক্ষীণ হইয়া যাইতেছিল—আজ আবার সেই আশা ঐ বর্ষাকালের ত্রিস্রোতার ন্যায় হৃদয় প্লাবিত করিতেছে।

যেমন আঁধারে আঁধারে সেই ত্রিস্রোতা-ধারা—সেই বিশাল জলধারা সমুদ্রায় সন্ধানে পক্ষিণীর বেগে ছুটিতেছিল—তেমনই নীরবে প্রফুল্লের স্বামিমিলন-আশা কল্পনার বেগে সেই স্বামীর অভিমুখে ছুটিতেছিল। যেমন ত্রিস্রোতার কূলে কূলে অসংখ্য কল কল শব্দ, আবর্ত্তের গর্জ্জন, প্রতিহত স্রোতের গর্জ্জন, সর্ব্বশুদ্ধ একটা গম্ভীর গগনব্যাপী শব্দ উঠিতেছিল—চাহিয়া দেখিলে প্রফুল্লের সেই আশাস্রোতের সেইরূপ কূলে কূলে অসংখ্য কল কল শব্দ আবর্ত্তের ও প্রতিহত স্রোতের গম্ভীর গর্জ্জন সর্ব্বশুদ্ধ একটা গম্ভীর হৃদয়ব্যাপী শব্দ উঠিতেছিল। সেই মিলনের বাধা অনেক—সেই বিঘ্নের কথা যখন মনে উঠিত, প্রফুল্লের হৃদয়ে ঠিক ঐরূপই গর্জ্জন হইত—সেই আশা যখন উচ্ছ্বসিত হইত, তখনও প্রফুল্লের হৃদয়ে ঠিক ঐরূপই গর্জ্জন হইত। ফলতঃ ঠিক ঐ ত্রিস্রোতার ধারার ন্যায় প্রফুল্লের স্বামিমিলনাশা অমনিই করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। তার পরে যেমন চন্দ্রের কিরণ সেই তীব্রগতি নদীর জলের স্রোতের উপর—স্রোতে, আবর্ত্তে, কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে জ্বলিতেছিল; কোথাও জল একটু ফুটিয়া উঠিতেছিল, সেখানে একটু চিকিমিকি কোথাও চরে ঠেকিয়া ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গ হইতেছিল, সেখানে একটু ঝিকিমিকি। প্রফুল্লের সেই স্বামি-মিলনাশা-স্রোতোপরি সেই স্বামি-মিলন-সুখ-স্মৃতি তেমনি পতিত হইয়া তেমনই কখনও চিকিমিকি কখনও ঝিকিমিকি করিতেছিল। সেই তেমনই করিয়া মিলন-পথে বিঘ্নচিন্তায় যখন আশা-স্রোত প্রতিহত হইতেছিল; সেখানে সেই সুখ যেন উজ্জ্বলতর হইয়া তেমনই ঝিকিমিকি করিতেছিল।

এই বর্ণনার প্রতিছত্রে এইরূপ অদ্ভুত কবিত্ব আছে—কিন্তু সকল খুলিয়া দেখাইতে পারি, আমাদিগের সে সাধ্য নাই—সে স্থানও নাই।

ঘটনা—

দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসের একটি ঘটনা বড়ই সুন্দর প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই প্রকৃতি-সাহায্যে দেবীর বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ ঘটনাটী বড়ই কৌশলময়। এই অদ্ভুত, প্রায় দৈবব্যাপার তুল্য, অথচ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ঘটনা বড়ই প্রীতিপ্রদ ও অভীষ্ট ফলদায়ক।

ইতিবৃত্ত।

১২৯১ সনের ১৩ বৈশাখ, 'দেবীচৌধুরাণী' পৃথক উপন্যাসাকারে প্রকাশিত হয় পূর্ব্বে, ইহার কিয়দংশ "বঙ্গদর্শন"-পত্রে প্রকাশিত হইয়া ছিল। অদ্যাবধি ইহার ৭টি সংস্করণ হইয়াছে।

দেবী চৌধুরাণী লিখিবার সময়ে গ্রন্থকার কলিকাতা বৌবাজারে থাকিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র।

তৃতীয় ভাগ।

আনন্দমঠ-দেবীচৌধুরাণী-সীতারাম।

সীতারাম।

চরিত্র-বিশ্লেষণ—ব্যাখ্যা—সমালোচনা।

(১) সীতারাম।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কয়েকটি সুন্দর তত্ত্বের বিবৃত্তি জন্য 'সীতারাম' উপন্যাস প্রণীত হইয়াছে। গীতার যে শ্লোকগুলিতে সেই তত্ত্ব অন্তর্নিবিষ্ট, তাহা গ্রন্থকার পৃথক্‌ভাবে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। শ্লোকগুলি দুই ভাগে বিভক্ত।

একভাগের শ্লোকগুলি এইরূপ :—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্‌বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥
রাগদ্বেষ বিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥"

গীতা, ২অ, ৬২-৬৪ শ্লোক।

ইহার অর্থ এইরূপ করা যায় :—

(কোন) বিষয় সম্বন্ধে ধ্যান (প্রগাঢ় চিন্তা) হইতে পুরুষের তাহাতে আশক্তি জন্মে। আশক্তি হইতে অভিলাষ বা তৃষ্ণা এবং অভিলাষ বা তৃষ্ণা হইতে (তাহা প্রতিহত হইলে—পূর্ণ না হইলে) ক্রোধ সঞ্জাত হয়। ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে (ধর্ম্মনীতি প্রভৃতির) স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ উপস্থিত হয়। যিনি আত্মাকে বশীভূত করিয়াছেন, তিনি রাগদ্বেষহীন আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিষয় ভোগ করিয়াও আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতাগুলি এই :—

"জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব॥

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমাপ্নুয়াম্ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥
ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥
নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥
নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥
যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥"

গীতা, ৩অ, ১—৯ শ্লোক।

বাঙ্গালায় এইরূপ অনুবাদ করা যায় :—

অর্জ্জুন কহিলেন,—"হে জনার্দ্দন, হে কেশব, যদি কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, ইহাই তোমার অভিমত হয়, তবে কেন আমাকে নিদারুণ (যুদ্ধ) কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছ? (কখন কর্ম্মের প্রশংসা, কখন জ্ঞানের প্রশংসা) এইরূপ বিমিশ্র সন্দেহউৎপাদক বাক্যের ন্যায় বাক্যে আমার বুদ্ধি যেন মোহিত করিতেছে। যাহাতে আমি শ্রেয়োলাভ করি, এমন একটি নিশ্চয় করিয়া বল।"

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—"হে অনঘ, এই লোকে দুই প্রকার নিষ্ঠা বা মোক্ষোপায় আমি পূর্ব্বে কহিয়াছি—সাংখ্যদিগের জ্ঞানযোগনিষ্ঠা ও যোগীদিগের কর্ম্মযোগনিষ্ঠা। কর্ম্ম না করিলেই নৈষ্কর্ম্ম (জ্ঞানের) অবস্থা লাভ করিতে পারে না। (বিনা জ্ঞানে) কেবলমাত্র কর্ম্মত্যাগেই সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কোন অবস্থায় ক্ষণমাত্রও কেহ কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না; প্রকৃতিজ গুণসকল সকলকেই বাধ্য করিয়া কর্ম্ম করায়। যিনি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল ভাবনা করেন, সেই বিমূঢ়াত্মাকে কপটাচার বলা যায়। হে অর্জ্জুন, যিনি কিন্তু মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ দ্বারা নিষ্কাম কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, সেই ফলাভিলাষশূন্য কর্ম্মকারীই সবিশেষ প্রশংসাযোগ্য। তুমি অনুষ্ঠেয় অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন কর; যেহেতু কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা ভাল; কর্ম্ম না করিলে তোমার শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ হইবে না। যে কর্ম্ম বিষ্ণুর জন্য অনুষ্ঠিত না হয়, লোকে তদ্দ্বারাই আবদ্ধ; অতএব তুমি আসক্তি ত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর উদ্দেশে (তাঁহার প্রীতিজনক) কর্ম্মানুষ্ঠান কর।"

এই দুই শ্রেণীর শ্লোক-মধ্যে—প্রথমোক্ত শ্লোকগুলি সীতারামচরিত্রে মুখ্যভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে; শেষোক্ত শ্লোকগুলি শ্রী ও জয়ন্তী চরিত্রে মুখ্যভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। অন্যান্য চরিত্রোপরি ইহার কার্য্য তত সুস্পষ্ট নহে। ফলতঃ এই তিনটি চরিত্র লইয়াই "সীতারাম" উপন্যাস—ইহাই সীতারাম সঙ্গীতের মূল সুর—নন্দা ও রমা মূর্চ্ছনাদি মাত্র। যেমন "দেবীচৌধুরাণীতে" প্রফুল্ল—নিশাই মূল চরিত্র—সাগর প্রভৃতি সাজ মাত্র, "সীতারামেও" শ্রী, জয়ন্তী, সীতারাম ভিন্ন অন্যান্য চরিত্র সেইরূপ সাজমাত্র ফলতঃ "সীতারাম" দেবীচৌধুরাণীরই অপর পৃষ্ঠা শ্রী প্রফুল্লেরই অপর পৃষ্ঠা নিশা ও

জয়ন্তীতে প্রভেদ মাত্র নাই। তবে জয়ন্তী যেন নিশার পূর্ব্বরূপ। আবার এই দুইখানি গ্রন্থই 'আনন্দমঠের' অপরাংশ বলিলে হয়। জীবানন্দ সেখানে সন্ন্যাসী, গৃহস্থ-বধূ শান্তি তাঁহার সহধর্ম্মিণীত্ব দেখাইতেছেন—এখানে ব্রজেশ্বর সংসারী, সন্ন্যাসিনী প্রফুল্ল তাঁহার সহধর্ম্মিণীত্ব দেখাইতেছেন—দুয়েরই অপূর্ব্ব ফল দেখিলাম। আবার এখানে সীতারাম রাজা—সন্ন্যাসিনী শ্রী তাঁহার সহধর্ম্মিণীত্ব দেখাইতে পারিলেন না, তাহারও অদ্ভুত ফল প্রত্যক্ষ করিলাম। সীতারামের শ্রী যদি প্রফুল্ল হইত, রমা যদি শান্তি হইত, তবে কি ফল হইত—দেবী-চৌধুরাণীতে ও আনন্দমঠে পড়িলাম; জীবানন্দের শান্তি যদি রমা বা শ্রী হইত—তবে কি হইত, সীতারামে পড়িলাম। এইরূপ কত আর দেখাইব—গ্রন্থ তিনখানি যেন এক মহা-গ্রন্থের তিনটি অংশ মাত্র।

আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাব—"সীতারাম" উপন্যাস লইয়া; আমরা এখন তাহাই আরম্ভ করিব। প্রথমে সীতারামের কথা বলিব, পরে অন্যান্য চরিত্রের কথা বলিব।

এমন লোক কেহ এ জগতে আছেন কি, যিনি জন্মাবধি কোন দিনও ভাবেন নাই যে, কেন এ জগৎ—কেন এ মানব-জন্ম? কি করিতে আসিয়াছি—কি করিব? এই যে দিনরাত্রি অর্থোপার্জ্জন চেষ্টায় বিব্রত হইয়া ভোগসুখকেই জীবনের সার কার্য্য স্থির করিয়াছি, ইহাই কি কর্ত্তব্য—না, আর কিছু আমাদের কর্ত্তব্য আছে? এই যে ভোগাদির বাসনা নিয়ত হৃদয়মধ্যে দাবানল জ্বালিতেছে, ইহার সেবাই ধর্ম্ম—না ইহার দমন আবশ্যক? ঐ যে বাবুটি অনুদিন অর্থোপার্জ্জন করিয়া ভোগাভিলাষ পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিয়া তাহারই উপায় অন্বেষণ করিতেছেন, উনিই ভাল করিতেছেন—না, ঐ যে সন্ন্যাসীঠাকুর ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিয়া ভস্ম মাখিয়া ঐ গাছতলায় পড়িয়া আছেন, উনিই ভাল করিতেছেন? গৃহী হওয়া ভাল—না, সন্ন্যাসী হওয়া ভাল—না, উন্নতি-বিধায়ক কর্ম্ম ভাল? কেহ এমন এ জগতে আছেন কি, যিনি পর্য্যায়-ক্রমে একবার সংসার ও একবার সন্ন্যাসের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করেন নাই? একবার ভাবেন নাই যে, সন্ন্যাস ভগবানের অভিপ্রেত নহে—তাহা হইলে এই কামপ্রবৃত্তি, এই স্নেহসুখ, এই ইন্দ্রিয়-সুখ সৃষ্ট হইল কেন? যদি ইহার উচ্ছেদই ভাল হইত, তবে ইহার উৎপত্তি হইল কেন? আর সন্ন্যাসই যদি ভাল হয়, তবে সৃষ্টি চলিবে কিরূপে? কাম-প্রবৃত্তির উচ্ছেদে যে মনুষ্যের উৎপত্তি নিবারিত হইবে; রাজা বা শাসনকর্ত্তার অভাবে যে সন্ন্যাস অপালনীয় হইবে; তখন কে কাহাকে রক্ষা করিবে? আবার অন্যবার ভাবেন নাই যে, ধিক্ এ সংসারে—যেখানে সুখের উপরে মানুষের কর্ত্তৃত্ব নাই, জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিপরিপূর্ণ এই সংসারের সুখ যে কেবল দুঃখেরই আবরণ মাত্র। একটু ঘর্ষণেই প্রকৃত দুঃখই যে বাহির হইয়া পড়ে! ঐ যে কামলালসা, কৈ ইহাতে ত প্রকৃত সুখ পাইলাম না! উহাতে অতৃপ্তিই আনয়ন করে, তৃপ্তি ত আনিতে দেখা যায় না! আর উহার ভোগই বা সম্যক্‌রূপে হইতে পারে কৈ

আমি কুৎসিৎ, আমি অর্থহীন, কোন সুন্দরী রমণী ত আমার ভোগ্য হইবে না! আর অর্থ—তাহাই বা কি অদ্ভুত ব্যাপার—আমি দিনরাত্রি গায়ের রক্ত জল করিয়াও দুইটি পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারিতেছি না, আর একজন কি না, বিনা-পরিশ্রমে জন্ম হইতেই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি! ধনার্জ্জন সকলে করিতে পারে না—যশোলাভও সকলের ভাগ্যে ঘটে না; কিন্তু ঐ যে সন্ন্যাসীঠাকুর বেশ শান্তচিত্তে বৃক্ষমূলে বসিয়া আনন্দলাভ করিতেছে, উহা ত বুঝি সকলেই হইতে পারে! ভগবানের বুঝি উহাই অভিপ্রেত। উহাতে আর কোন বৈষম্য নাই—ধনের নাই, যশের নাই, রূপের নাই, গুণের নাই—সব সন্ন্যাসী এক! আর সন্ন্যাসী হইলে যে সংসারীর সকল সুখই পাওয়া যায়! এমন কঠোর মৃত্যুকষ্ট, তাহাও কমিয়া যায়, এমন যে দুঃখদায়িনী মায়া, তাহারও ত হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়! একবার ভাবেন নাই যে, সংসারধর্ম্ম ধর্ম্মানুমোদিত হইলে তাহাই শ্রেষ্ঠতর—যাহাদিগকে রিপু ভাবি, তাহারা সুসংযত হইলে, সৃষ্টিরক্ষা করিয়া সংসারীকে সুখী করে। সন্ন্যাস প্রকৃতিবিরুদ্ধ কার্য্য—সংসারই ভগবানের অভিপ্রেত। ধর্ম্মপথে থাকিলে, সংসারে কখনও ক্লেশ হইতে পারে না—সন্ন্যাসে ক্লেশই সার। আবার পরক্ষণই ভাবেন নাই যে, সংসারে ধর্ম্মপথে চলা যে প্রকৃত শিক্ষাবল না থাকিলে হয় না, আর সে শিক্ষা যে ঘরে বসিয়া হইবার নহে, তাহাও ঐ সন্ন্যাসীর কাছে শিখিতে হইবে। যেমন সংসার ভিন্ন সন্ন্যাস হয় না, তেমন যে সন্ন্যাস ভিন্নও সংসার হয় না। আগে থাকে শিশুকাল ও প্রাচীনকাল—মধ্যে যৌবনকাল। সংসারীর প্রথম শিক্ষা—সন্ন্যাসে; আবার সংসারের পরিণতি বা চরমোন্নতি—সন্ন্যাসে। কামাদির উচ্ছেদ দ্বারা তৃপ্তিলাভের চেষ্টায় যে কষ্ট, শিক্ষা দ্বারা উহা সংযতরূপে ব্যবহার করিয়া তৃপ্তিলাভের চেষ্টায় যে তদপেক্ষা সহস্র গুণ কষ্ট। বড়ই বিষম এই সমস্যা—সংসার না সন্ন্যাস—কার্য্যানুষ্ঠান না কর্ম্মত্যাগ—আসক্তি না বিরতি! কবি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসত্রয়ে জীবনের এই সমস্যার সমালোচনা করিয়াছেন।

গীতায় গৌণভাবে আর অনেক তত্ত্ব থাকুক—কিন্তু মুখ্যভাবে ইহাই তাহাতে বিবৃত হইয়াছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ-ছলে এই সমস্যা ব্যাখ্যা করিয়াছেন—এই সমস্যাই গীতার মজ্জা। বোধ হয় এই সমস্যা তখন লোকদিগকে অত্যন্ত আন্দোলিত করিতেছিল—লোকে সংসারে থাকিয়াও সন্ন্যাসীর কথা কহিত। সময় বুঝিয়া ভগবান এই সমস্যা ব্যাখ্যা করিলেন—নূতন কিছু বলিলেন না—পূর্ব্বোক্ত লুপ্ত ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। * আর আজি যদি বলিতে দেও, তাঁহার দাসানুদাস ভক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সময় বুঝিয়াই তাহা বিবৃত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

সংসার না সন্ন্যাস—কর্ম্ম না জ্ঞান—ইহার কোনটি শ্রেয়ঃ—তাহা ভগবান

* "ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ।
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ।"

অর্জ্জুনকে তৃতীয় অধ্যায়ে উপদেশ দিয়াছেন ; এবং সেই উপদেশই "সীতারাম" উপন্যাসের মস্তকে শোভা পাইতেছে। ভগবান যাহা বলিয়াছেন, তাহার বঙ্গানুবাদ দিয়াছি ; এখন তাহার ব্যাখ্যা এইরূপ করিতে চাহি। ভগবান বলিলেন—স্থূলতঃ ইহার কোনটী পূর্ণ নহে—সংসার-সন্ন্যাসই পূর্ণ ধর্ম্ম। সংসারী না হইয়া, কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি না করিয়া, জ্ঞান উপার্জ্জন না করিয়া, কর্ম্মত্যাগে মোক্ষ হইতে পারে না ; আবার সন্ন্যাসী না হইয়া, কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ না করিয়া, কর্ম্ম করিলে, তাহাকে সংসার-ধর্ম্মও বলা যাইতে পারে না। যিনি সংসারী হইয়া সন্ন্যাসী, বা যিনি সন্ন্যাসী হইয়া সংসারী, তিনিই প্রকৃত ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়াছেন। জনকাদি রাজর্ষিগণই প্রকৃত ধর্ম্মবেত্তা। ফল-আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম করাই প্রকৃষ্ট কর্ম্ম।

এখন এই অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম কি ? সকলের পক্ষে কিছু তাহা সমান হইতে পারে না ; লোকের অবস্থা-ভেদে, পরিবার-ভেদে, দেশভেদে, কাল-ভেদে ইহার বিভিন্নতা হইবে। অর্জ্জুনের দেশকাল-অবস্থানুসারে তখন যুদ্ধই অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম হইয়াছিল, তাই তাঁহাকে সেই কর্ম্ম করিতে ভগবান আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তুমি যদি অস্ত্র লইয়া তোমার পিতামহকে বিনাশ করিতে যাও, তবে তাহাতে কি ভগবানের অনুমোদিত কার্য্য হইবে ? তাহা নহে।

এই অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বুঝিতে ভয়ানক ভ্রান্তি জন্মিয়া থাকে। তোমার আমার ত জন্মিতেই পারে ; অমন যে শ্রী, জয়ন্তী, সীতারাম—তাঁহাদের ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল। এই ভ্রান্তি-রহস্য সীতারাম উপন্যাসে বিবৃত দেখিতে পাইবে—সেই কথা এখন বলিতেছি।

সীতারাম-চরিত্র বুঝিতে হইলে, তাঁহার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম কি, তাহা বুঝিতে হইবে ; তাহা তিনি কিরূপ সম্পন্ন করিয়া-কোন্ কোন্ বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া তিনি তাহা করিয়াছেন, তাঁহার সেই সেই কার্য্যের কিরূপ মুখ্য ও কিরূপ গৌণ ফল দাঁড়াইয়াছে, তাহাই তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে হইবে, নতুবা সীতারাম বুঝিবে না। সীতারাম উপন্যাস চিনি বা মিশ্রীর সরবৎ নহে যে, চোঁ করিয়া পান করিলেই রসনার তৃপ্তি জন্মিবে। ইহাকে ইক্ষুদণ্ডের ন্যায় কষ্ট করিয়া ছাড়াইয়া লইতে হইবে, তবে ইহার রস বুঝিতে পারিবে। ইহাতে একটু দাঁত থাকিলে ভাল হয়, পরে ছাড়াইয়া দিলেও ইহাতে দন্তের আবশ্যক।

সীতারামের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম কি, তাহা বুঝাইবার জন্য গ্রন্থকার প্রথম পরিচ্ছেদটি লিখিয়াছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধমাত্র নাই। উহাতে কেবলমাত্র তখনকার ফকিরের প্রতাপ, মুসলমানের ক্ষমতা ও হিন্দুর প্রতি যবনের অত্যাচারের কথা বর্ণিত হইয়াছে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কিছু লিখিত না থাকিলেও, উহাতেই সীতারামের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সূচিত হইয়াছে। তুমি ঐ স্থানে বসিয়া আছ, তোমার সম্মুখে তোমার একজন পরিচারক দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, দস্যু তাহাকে বধ করিতে যাইতেছে—এ স্থলে তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম কি, তাহা কি আর

বলিয়া দিতে হইবে? তাই, সীতারামের প্রথম অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম দেখিলাম—মুসলমানের অন্যায় অত্যাচারের হস্ত হইতে হিন্দুর মুক্তি-সাধন। তবে কি সেই সময়ে সকলেরই তুল্যভাবে সেই একই মাত্র অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম ছিল? তাহা নহে। যাহার যেমন শক্তি, যেমন অবস্থা, তদনুসারেই ত তাহার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম স্থির হইবে! সীতারাম পরাক্রান্ত, রাজসদৃশ লোক, বুদ্ধিমান, ধার্ম্মিক, চেষ্টা করিলে হিন্দুকে কতক পরিমাণে অত্যাচার হইতে মুক্ত করিতে পারেন, তাই তাঁহার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম—সেই অত্যাচার হইতে হিন্দুর রক্ষা-সাধনের চেষ্টা করা। প্রথমে কিছু অত অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম হয় নাই—প্রথম অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম হইল—গঙ্গারামকে রক্ষা করা। প্রথম পরিচ্ছেদে ইহাই দেখিতে পাইলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সীতারামের আর একটা ক্ষুদ্র অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম দেখিলাম। সীতারামের আরম্ভ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে।

এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেখিলাম—সীতারামের এক পরিণীতা ভার্য্যা পরিত্যক্তা হইয়া আছে। তাহার নাম—শ্রী। শ্রীকে সীতারাম ধর্ম্মপত্নী করিয়াছিলেন—শ্রী পতিব্রতা, শ্রী সাধ্বী, শ্রী সুন্দরী, শ্রী কলঙ্কশূন্যা। কিন্তু তাহা হইলেও সীতারাম তাহাকে সহধর্ম্মিণী করেন নাই। কারণ আমরা পরে পাইয়াছি। তবে তাহা এখানে বলিলেও ক্ষতি নাই—কারণ, কে ভবিষ্যৎ গণিয়া বলিয়াছে যে, শ্রী তাহার 'প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী' হইবে। সেই শ্রীর প্রিয়—সুতরাং সীতারাম শ্রীকে গ্রহণ করিলে, তাঁহার অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা। তাই, শ্রী বিনাদোষে পরিত্যক্তা। সর্ব্বপ্রথমে দেখিলাম, সীতারাম এই অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে পরাঙ্মুখ—ভার্য্যাকে, সহধর্ম্মিণীকে প্রাণ-ভয়ে এরূপ পরিত্যাগে তাঁহার অধর্ম্ম, কিন্তু সীতারাম তাহা স্বীকার করিতেছেন। কথাটি সহজ নহে—এই এক কথায় সীতারাম তোমার আমার মত সাধারণ হইয়া যায়। তাই কবি মধ্যে সীতারামের পিতাকে দাঁড় করাইলেন—দেখাইলেন, সীতারাম স্ত্রীত্যাগ করিয়াছেন, পিতৃ-আজ্ঞা-পালনার্থে। পিতার কথায় স্ত্রী পরিত্যাগ করিলেন, কথাটাতে সীতারাম-চরিত্র বাঁচিয়া গেল—ঘাতপ্রতিঘাত আসিল এবং কাব্যও জমিল। কবি এক হাত দেখাইয়া চলিয়া গেলেন। আমরা বিস্মিত-চিত্তে আন্দোলন করিতে লাগিলাম—সীতারাম ভাল করিয়াছেন, না মন্দ করিয়াছেন?—পিতার কথায় স্ত্রীত্যাগ, রজেশ্বরও করিয়াছিল—সীতারামও করিলেন। আমরা সীতারামের এ সম্বন্ধে অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম কি, সহসা বুঝিতে পারিলাম না—বুঝিতে চেষ্টাও করিলাম না। কিন্তু সীতারাম তাহা পরে স্বয়ংই বলিয়া গিয়াছেন,—

"—কিন্তু পিতা যদি অধর্ম্ম করিতে বলেন, তবে তাহা কি পালনীয়? পিতা মাতা বা গুরুর আজ্ঞাতেও অধর্ম্ম করা যায় না—কেন না, যিনি পিতা-মাতার পিতামাতা এবং গুরুর গুরু, অধর্ম্ম করিলে তাঁহার বিধি লঙ্ঘন করা হয়। বিনাপরাধে স্ত্রীত্যাগ ঘোরতর অধর্ম্ম। অতএব আমি পিতৃ আজ্ঞা পালন করিয়া অধর্ম্ম করিয়াছি। ইত্যাদি——"

ইহাতে আপাততঃ প্রতীত হয় যে, সীতারাম তাঁহার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম জানিতেন,

বুঝিতেন ও তাহা পরিপালনে যাত্নিকও ছিলেন—তবে ঘটনাধীন কিছু দিন তাহার অনুষ্ঠানে বিমুখ ছিলেন। ইহাতে সীতারামের প্রতি অর্পিত দোষভার এক-দিকে কিছু লঘু হইয়া পড়ে। কিন্তু গ্রন্থ-কার আর এক গোল বাধাইলেন—আবার এক প্রহেলিকায় আমাদিগকে মুগ্ধ করিতে চাহিলেন। সে ব্যাপারটি এই—

শ্রীর বিষয় সীতারাম যে দিন প্রথম ভাবিলেন, সে দিন শ্রী সামান্যা রমণীর ন্যায় সীতারামের নেত্রপথে পতিত হয়েন নাই। একে পরমা সুন্দরী—তার পরে শ্রী সেদিন মাতৃহারা—একমাত্র সহোদরের প্রাণও যায় যায়, এইরূপ ভাব। অমন সুন্দরী স্ত্রী অমন অবস্থায় পতিতা, তার জন্য ভাবনা না হইবে কেন? তার পরে আবার শ্রীর অপূর্ব্ব বাগ্মীতা—

"দেখ, দেবতা আছেন, ধর্ম্ম আছেন, নারায়ণ আছেন। কিছুই মিথ্যা নয়। তুমি দীনদুঃখীকে বাঁচাইলে তোমার কখন অমঙ্গল হইবে না। হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?"

ধার্ম্মিক হিন্দু সীতারামের নিকটে অমন অত্যাচারবহুল স্থানকালে এইরূপ কথা—ধর্ম্মের জন্য না হইলেও সীতারাম যে শ্রীকে এই সকল কারণে গ্রহণীয় মনে করেন নাই, কে বলিতে পারে? তাই সীতারামের শ্রী সম্বন্ধে বিচারটা কঠিন হইয়া পড়িল। কবি কিন্তু কিছু সহজ করিবার চেষ্টা করিলেন—তাঁহার অমন স্নেহের সীতারামকে প্রথমেই তোমরা কর্ত্তব্যবিমুখ দেখিবে, তাহাতে তাঁহার কিছু কষ্ট হইল; তাই সীতারামের পক্ষে কিছু ওকালতী করিলেন। সে ওকালতী এই—

"তা, কথাটা কি আজ সীতারামের নূতন মনে হইল? না। কাল শ্রীকে দেখিয়া মনে হইয়াছিল। কাল কি প্রথম মনে হইল? হাঁ, তা বৈ কি? সীতারামের সঙ্গে শ্রীর কতটুকু পরিচয়? বিবাহের পর কয়দিন দেখা—সে দেখাই নয়—শ্রী তখন বড় বালিকা। তার পর সীতারাম ক্রমশঃ দুই বিবাহ করিয়াছিলেন। তপ্তকাঞ্চন শ্যামাঙ্গী নন্দাকে বিবাহ করিয়াও বুঝি শ্রীর খেদ মিটে নাই—তাই তাঁর পিতা আবার হিমরশ্মিপ্রতিফলিত কৌমুদী-রূপিণী রমার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিয়া-ছিলেন। আজ একজন বসন্তনিকুঞ্জ প্রহ্লা-দিনী অপূর্ণা কল্লোলিনী; আর একজন বর্ষাবারিরাশি-প্রমথিতা পরিপূর্ণা স্রোত-স্বতী। দুই স্রোতে শ্রী ভাসিয়া গেল। তার পর আর শ্রীর কোন খবরই নাই।

"স্বীকার করি, তবু শ্রীকে মনে করা সীতারামের উচিত ছিল। কিন্তু এমন অনেক উচিত কাজ আছে, যে কাহারও মনে হয় না। মনে হইবার একটা কারণ না ঘটিলে মনে হয় না। যাহার নিত্য টাকা আসে, সে কবে কোথায় সিকিটি আধুলিটা হারাইয়াছে, তার তা বড় মনে পড়ে না। যার একদিকে নন্দা আর দিকে রমা, তার কোথাকার শ্রীকে কেন মনে পড়িবে? যার একদিকে গঙ্গা, এক-দিকে যমুনা, তার কবে কোথায় বালির মধ্যে সরস্বতী শুকাইয়া আছে, তা কি মনে পড়ে? যার একদিকে চিত্রা, আর একদিকে চন্দ্র, তার কবে কোথাকার

নিবান বাতির আলো কি মনে পড়ে? রমা সুখ, নন্দা সম্পদ, শ্রী বিপদ—যার একদিকে সুখ, আর দিকে সম্পদ, তার কি বিপদকে মনে পড়ে?

"তবে সে দিন রাত্রে শ্রীর চাঁদপানা মুখখানা, ঢলঢল ছলছল জলভরা বলহারা চোক দুটো, বড় গোল করিয়া গিয়াছে। রূপের মোহ? আ ছি! ছি! তা না। তবে তার রূপেতে, তার দুঃখেতে আর সীতারামের স্বকৃত অপরাধে, এই তিনটায় মিশিয়া গোলযোগ বাধাইয়াছিল। তা যা হউক—তার একটা বুঝা-পড়া হইতে পারিত; ধীরে সুস্থে, সকল বুঝিয়া, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিয়া গুরুপুরোহিত ডাকিয়া, পিতার আজ্ঞা-লঙ্ঘনের একটা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া, যা হয় না হয় হইত। কিন্তু সেই সিংহবাহিনী মূর্ত্তি? আ মরি মরি—এমন কি আর হয়!

"তবে সীতারামের হইয়া এ কথাটাও আমার বলা কর্ত্তব্য, যে কেবল সেই সিংহবাহিনী মূর্ত্তি স্মরণ করিয়াই সীতারাম, পত্নীত্যাগের অধার্ম্মিকতা হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। পূর্ব্ব রাত্রে যখনই প্রথমে শ্রীকে দেখিয়াছিলেন, তখনই মনে হইয়াছিল, যে আমি পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া পাপাচরণ করিতেছি। মনে করিয়াছিলেন যে, আগে শ্রীর ভাইয়ের জীবন রক্ষা করিয়া, নন্দা রমাকে পূর্ব্বেই শান্তভাবাবলম্বন করাইয়া, চন্দ্রচূড় ঠাকুরের সঙ্গে একটু বিচার করিয়া, যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিবেন। কিন্তু পরদিনের ঘটনার স্রোতে সে সব অভিসন্ধি ভাসিয়া গেল। উচ্ছলিত অনুরাগের তরঙ্গে বালির বাঁধ সব ভাঙ্গিয়া গেল।"

যদি সত্যবাদী চন্দ্রচূড় ঠাকুরও সীতারামের দোষগুণ পর্য্যালোচনা করিতেন, তবু বোধ হয়, এমন রকমের আলোচনা তিনিও করিতে পারিতেন না। কবি একদিকে সত্যের অনুরোধে সীতারামের দোষ অস্বীকার করিতে পারিতেছেন না, অন্যদিকে প্রাণপ্রিয় সীতারামকে প্রথমেই এতটা দোষী সাব্যস্ত করিতে কোন মতেই তাঁহার মন উঠিতেছে না। তাই এই অদ্ভুত মন্তব্য। আমাদের বিবেচনায় এই ওকালতী বড়ই সুন্দর হইয়াছে। পাঠক! আমি ইহাকে ওকালতী বলিলাম কেন, বুঝিয়াছ কি? এই কথাগুলির এক বর্ণও মিথ্যা নহে—অথচ ইহা কঠোর বিচারেরও কথা নহে। সীতারামের পক্ষে যত দূর বলিবার, তাহা ইহাতে বলা হইয়াছে—বৃত্তান্ত সবই বর্ণিত হইয়াছে। এখন তুমি বিচারক, ইহা হইতে সত্য বাছিয়া করিয়া লও। যদি মনে হয়, সীতারামের ইহাতে দোষ ছিল না, কবির এই কথাতেই তাহা পাইবে; যদি মনে হয়, সীতারাম নির্দ্দোষ, ইহাতে তাহারও বীজ পাইবে।

কথা হইতেছিল এই যে, সীতারাম শ্রীর রূপগুণে ভুলিয়াই তাহাকে গ্রহণ যুক্তিসিদ্ধ মনে করিয়াছিলেন কি না? কবি বলিতেছেন কি, শুন—"রূপের মোহ! আ ছি! ছি! তা না।" তুমি মনে করিতে পার, তবে ত সীতারাম কর্ত্তব্যের জন্যই শ্রীকে গ্রহণ করা সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন? কিন্তু যদি তোমার কবির এ কথা বিশ্বাস না হয়, তবে তাঁহার পরের কথায় তুমি আর অসন্তুষ্ট থাকিবে না—"তবে তার রূপেতে, তার দুঃখেতে, আর সীতারামের স্বকৃত অপরাধে, এই তিনটায়

মিশিয়া গোলযোগ বাধাইয়াছিল।" দেখিলে, কবি কৌশলে রূপের মোহটি কেমন গোলে হরিবোল দিয়া অন্য কথায় মিশাইয়া দিলেন। সীতারাম নিজেও বোধ হয় এই রূপই ভাবিতেন। স্নেহের পাত্র সম্বন্ধে সকলের পক্ষে এইরূপই ঘটে।

আবার দেখুন, কবি বলিতেছেন—"কিন্তু সেই সিংহবাহিনী মূর্ত্তি! আ মরি—এমন কি আর হয়?" তুমি মনে করিলে, রূপে না হউক, গুণে মুগ্ধ হইয়া সাময়িক ঘটনায় বিমোহিত হইয়া সীতারাম অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম চক্ষে দেখিলেন; কিন্তু আবার ঐ শুন, কবি কি বলিতেছেন—তবে সীতারামের হইয়া এ কথাটাও আমার বলা কর্ত্তব্য যে, কেবল সেই সিংহবাহিনী মূর্ত্তি স্মরণ করিয়াই সীতারাম পত্নীত্যাগের অধার্ম্মিকতা হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। পূর্ব্ব রাত্রে যখনই শ্রীকে দেখিয়াছিলেন, তখনই মনে হইয়াছিল যে, আমি পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া পাপাচরণ করিতেছি।" সীতারাম নির্দ্দোষ বলিয়া আপাততঃ বোধ হইল, কিন্তু "কেবল" কথাটিতে কিছু গোল রহিয়া গেল। এ "কেবল" দুই দিকেই যায়। এটাও গোলে হরিবোল দিবার কথা। তা, যাঁহারা প্রকৃত কবি, তাঁহারা এইরূপই করেন। বিচার তুমি করিবে। কুহেলিকা-দণ্ড চালনাতেই ত কবির বাহাদুরি!

সীতারাম দোষী হউন আর নির্দ্দোষই হউন, সে কথা এখন বড় ছোট হইয়া গেল। সীতারামের পাপ থাকিলেও, নানা চেষ্টায় গ্রন্থকার তাহা তোমার সম্মুখে অতি ক্ষুদ্র করিয়া ধরিলেন। কিন্তু আমরা শেষে দেখিয়াছি যে, সীতারামের চরিত্রের বীজ এইখানেই পাওয়া যায়। ইহাতেই ত কবিত্ব।

সীতারামের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম স্থির হইল—প্রথম—গঙ্গারামকে, শ্রীর ভাইকে রক্ষা করা—অথবা ধর্ম্মের সাজ দিয়া বলিতে গেলে, স্বজাতি হিন্দুকে মুসলমানের অত্যাচার হইতে রক্ষা করা—দ্বিতীয় কর্ম্ম—শ্রীকে গ্রহণ করা।

সীতারাম প্রথম অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন—অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সুচেষ্টায় সিদ্ধি প্রদ হইল—গঙ্গারাম বাঁচিল। কিন্তু জানি না, এই কর্ম্মসম্পাদনে তাঁহার কর্ত্তব্যবোধ ভিন্ন অন্য কোন একটা বাসনা ছিল কি না—গঙ্গারাম শ্রীর ভাই না হইয়া অন্য হইলে তিনি তাহার জন্য অত চেষ্টা করিতেন কি না; যদি থাকে, তবে সীতারামের বিষবৃক্ষের পুষ্টি এই কার্য্যেও কিছু হইয়া থাকিবে। থাক্, অত সূক্ষ্ম বিচার এখন নাই বা করিলাম।

পরের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম—সীতারামের শ্রী-গ্রহণ। শ্রী সুন্দরী, শ্রী দুঃখিনী, শ্রী বিনাদোষে পরিত্যক্তা, আবার সেই শ্রী এক নূতন ধরণের রমণী। নন্দা বা রমা কেহই সেরূপ নহে—সীতারামের যাহা আবশ্যক, শ্রীতে তাহাই বিদ্যমান। শ্রী সীতারামের রাজধর্ম্মে সহায় হইবার যোগ্যা। "স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের ভালবাসাই দাম্পত্য সুখ নহে, একাভিসন্ধি—সহৃদয়তা-ইহাই দাম্পত্য সুখ।" নন্দাও তাঁহাকে সেই সুখ সম্যক্ প্রদান করিতে পারে নাই। তাই সীতারামের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বড়ই প্রীতিজনক হইয়া পড়িল। বাধা কয়েকটি ছিল বটে;—১ম, পিতৃ-আজ্ঞালঙ্ঘনের ভয়; ২য়, নিজের প্রাণের

ভয়; ৩য়, নন্দা রমার অসন্তুষ্টির ভয়। ৪র্থ, অন্যের অসন্তুষ্টির ভয়। প্রথমটা সীতারাম যখন কাটাইলেন, অপরগুলি অনায়াসেই কাটাইতে পারেন। সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কর্ম্ম—পিতৃ-আজ্ঞালঙ্ঘন—তিনি তাহাতেও প্রস্তুত। অন্য গুলি অতি ক্ষুদ্র বিষয়। তাই সীতারাম সর্ব্বতোভাবেই স্থির করিলেন, শ্রীকে গ্রহণ করা তাঁহার একটা অতি প্রধান অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম।

এই জগতের কর্ম্মরহস্য বুঝা বড়ই কঠিন ব্যাপার। স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন—

"কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।"
"কর্ম্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ।"

কি কর্ম্ম, কি অকর্ম্ম এই বিষয়ে বিবেকিগণও [মোহিত] হন। বিহিত কর্ম্ম কি, তাহাও নির্ণয় বুদ্ধি-সাপেক্ষ—অবিহিত কর্ম্ম কি, তাহা নির্ণয় করিতেও জ্ঞানের আবশ্যকতা আছে—আর নিষিদ্ধ কর্ম্ম কি, তাহাও সহজ বুদ্ধিতে বুঝা যায় না। কর্ম্মের গতি অতি দুর্জ্ঞেয়।

কেবলমাত্র শাস্ত্র দেখিয়া কর্ম্মাকর্ম্ম স্থির করা যায় না—তাহা মানুষের অবস্থার সহিত মিলাইয়া বিচার করিতে হইবে। এক অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম অপরের বিরোধী হইলে, তাহা বিচার করিয়া গ্রহণাগ্রহণ করিতে হইবে। বড় সহজ নহে—এ কথা।

মানুষের যদি একটী মাত্র অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম হইত, তবে তাহার অনুষ্ঠান করিতে বড় বেশী বিরোধ ঘটিত না। কিন্তু মানুষের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম অনেক—সময়ে সময়ে তাহার একটীর সহিত অন্যটির বিরোধও আছে বলিয়া বোধ হয়। তাহাতেই মানুষ দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া নানাপ্রকারে বিব্রত হইয়া পড়ে। সীতারাম জানিতেন, তাঁহার প্রধান অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম—হিন্দুগণকে মুসলমানের অত্যাচার হইতে রক্ষা করা। ধার্ম্মিক সীতারাম প্রাণপাত করিয়া তাহা পালন করিতে লাগিলেন। অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম যেরূপ করিতে হয়, তাহাই করিতে লাগিলেন। কার্য্য সিদ্ধি হইল—সীতারাম বড় সুন্দর এক ধর্ম্মসাম্রাজ্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইলেন। তাঁহার রাজ্যে হিন্দু-মুসলমান সমান ভাবে পালিত হইতে লাগিল—প্রজাগণ রাজার ব্যবহারে পরম প্রীত হইয়া একান্ত রাজভক্ত হইয়া পড়িল। এমন কি, সীতারাম এমনই পক্ষপাতশূন্য চিত্তে রাজ্যরক্ষা করিতে লাগিলেন যে, একজন প্রধান মুসলমান ফকিরও তাঁহার রাজ্যের একান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইল। যেমন চন্দ্রচূড়, তেমনই চাঁদশাহ—উভয়েই তুল্যরূপে সীতারামের মন্ত্রণাকার্য্যে ব্রতী হইলেন। এ সম্বন্ধে সীতারামের অনুষ্ঠান সুফল ধরিল।

কিন্তু সীতারাম শ্রী লইয়া কিছু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। স্বীকার করি, শ্রীকে গ্রহণ করা সীতারামের এক অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম ছিল, কিন্তু সীতারাম তাহা ধর্ম্মসঙ্গতরূপে পালন করিতে পারেন নাই। তাই সেই শ্রীই সীতারামের কাল হইল।

অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম করিবে—ইহা ভগবানের উপদেশ। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার জন্য উন্মত্ত হইলে পাপ হইবে। ভগবান বলিয়াছেন, আসক্তিশূন্য হইয়া অনুষ্ঠেয় কার্য্য কর। কেবলমাত্র কার্য্য অনুষ্ঠেয় হইলেই হইবে না—তাহাতেও আসক্তিত্যাগ চাই।

পুত্র-প্রতিপালনে অনুষ্ঠেয় কার্য্য, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে পুত্রস্নেহে আসক্তি জন্মিল, সেই মুহূর্ত্তেই তাহা অননুষ্ঠেয় মধ্যে পরিগণিত হইল। শ্রীকে গ্রহণ করা সীতারামের ত কর্ত্তব্য কার্য্য ছিলই—যদি সীতারাম তাহার জন্য যথা চেষ্টা করিতেন, কোন প্রকার মন্দ ফলই ঘটিতে পারিত না। কিন্তু সীতারামের সে কর্ত্তব্য কার্য্যও ও আসক্তিবশতঃ অকর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইল, সীতারাম তা বুঝিয়া তদ্দ্বারা নষ্ট হইলেন। কথাটি আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি।

সীতারাম শ্রীকে গ্রহণের প্রস্তাব করিলেন, আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম। শ্রী পলায়ন করিল—'প্রিয়- প্রাণহন্ত্রী' হইবে আশঙ্কায় পলায়ন করিল। সীতারাম তাহার অন্বেষণ জন্য লোক পাঠাইলেন; নিজে খুঁজিলেন; সবই ভাল দেখিলাম। কিন্তু যখন দেখিলাম, সীতারাম শ্রীর জন্য আত্মহারা হইয়াছেন—শ্রীর সেই মহিমাময়ী সিংহবাহিনী মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে আস্তে আস্তে কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইতেছেন, তখন বুঝিলাম, শ্রীর অন্বেষণে সীতারামের চেষ্টা ধর্ম্মসঙ্গত নহে—ঘোর আসক্তি পরিপূর্ণ—বোধ হয় (যেমন প্রথমে বলিয়াছি) কিছু অতৃপ্ত ইন্দ্রিয়াকাঙ্ক্ষায়ও পরিপূর্ণ। কথাটা আরও পরিষ্কার দেখিতে লাগিলাম—দেখিলাম, শ্রীর অন্বেষণজন্য "রাজকর্ম্ম হইতে অবসৃত করিয়া" গঙ্গারামকে তাহার অন্বেষণে পাঠাইলেন; তখন বুঝিলাম, শ্রী রাজকর্ম্ম হইতেও উচ্চে উঠিয়াছে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার কবি একটু আশার বিজলী খেলাইলেন—বলিলেন—"শেষ সীতারাম স্থির করিলেন যে, আর শ্রীকে মনে স্থান দিবেন না। রাজ্যস্থাপনেই চিত্তনিবেশ করিবেন ইত্যাদি।" কাজও একটু দেখিলাম—সীতারাম দিল্লী গমন করিলেন—সেখানে কার্য্যসিদ্ধি করিয়া দেশেও অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। ভাবিলাম—সীতারামের আর কোন ভয় নাই। সীতারাম ধর্ম্মবলে বাঁচিয়া গিয়াছেন। কিন্তু হরি হরি—আবার এ কি শুনিলাম—সীতারামের সাধের রাজ্য আজি বিশ্বাসঘাতকতায় শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত—তিনি চুপ করিয়া বসিয়া আছেন; শুধু তাহাই নহে, যখন একজন সন্ন্যাসিনী স্ত্রীলোক তাঁহাকে বলিল—"যদি তুমি বীরপুরুষ হও, এই গোলাগুলি অনিয়া দিতেছি—এই পুরী রক্ষা কর।" সীতারাম কিছু ভাবিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, বলিলেন—"তাতেই বা কি? এই কি আমাদের সেই সীতারাম! কৈ, কবি ত বলিয়াছিলেন, সীতারাম শ্রীকে ভুলিবেন স্থির করিয়াছিলেন; সীতারাম ত কিছুই ভুলেন নাই! ভুলেন নাই বলিলে অতি শান্তভাব ব্যক্ত হয়; সীতারাম যে শ্রীর স্মৃতিতে অন্য সব ভুলিয়াছেন! দেশ যায়—ভ্রূক্ষেপ নাই, বীরপুরুষের ধর্ম্ম যায়—ভ্রূক্ষেপ নাই, সীতারাম উদাসীনের ন্যায় বলিলেন,—"তাতেই বা কি!" পরে আবার যখন জয়ন্তী বলিলেন,—"তুমি কি চাও?" সীতারাম বলিলেন,—"যা চাই, পুরী রক্ষা করিলে তা পাইব?" জয়ন্তী আশ্বাস দিলেন—সীতারাম রাজ্যরক্ষা করিলেন। করিলেন ত বড় কাজই—কিন্তু ইহাতে ত তাঁহার পতনের সূত্রপাতই দেখিলাম। সীতারাম বড় ঘোর আসক্তি

পরবশ—শ্রীপ্রাপ্তিরূপ ঘোর কামনার বশবর্ত্তী হইয়া রাজ্যরক্ষা করিতে লাগিলেন—ইহাকে কি তুমি ধর্ম্ম বলিবে? বলিতে পার, সীতারাম জয়ন্তীর নিকট ঐ বর না পাইলেই যে চুপ করিয়া থাকিতেন, তাহা নহে—উহা কেবল সময় পাইয়া একটা অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া লওয়ার চেষ্টা মাত্র। হউক তাহাই—তাহাতেও ত সীতারাম সমর্থিত হইল না অমন সময়েও ত শ্রীপ্রাপ্তি মনে আসিল—এই কি রাজা, না রাজার ধর্ম্ম?

তুমি আমি একদিনেই পড়িয়া যাই—সামান্য ঘর্ষণেই কীটের প্রাণবিয়োগ ঘটে, কিন্তু একদিনে প্রকাণ্ড মহীরুহ শুষ্ক হয় না। সীতারাম একদিনে পড়েন নাই—সীতারাম পড়িতে পড়িতেও অসীম বলপ্রকাশে উঠিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—কিন্তু ঘটনাচক্র তাঁহাকে উঠিতে দিল না—সীতারাম কি করিবেন?

গঙ্গারামের বিচারকালে আমরা প্রথমে মনে করিলাম, সীতারাম সত্যই রাজা—রাজধর্ম্মে অনুরক্ত না হইলে গঙ্গারাম, দর্শনমাত্রেই তাঁহার কোপানলে ভস্মসাৎ হইয়া যাইত। কিন্তু সে বিশ্বাস শীঘ্রই তিরোহিত হইল; জয়ন্তী রাজার নিকট গঙ্গারামের প্রাণভিক্ষা চহিলেন, রাজার শ্রী-স্মৃতি উদ্দীপিত হইল। রাজা জয়ন্তীর কথা রাখিলেন, কিন্তু তাহার বিনিময়ে শ্রীকে চাহিলেন। বুঝিলে পাঠক! না বুঝিয়া থাক—গ্রন্থকারের কথা শুন,—

"কথাটা শুনিয়া পাঠক সীতারামকে ধিক্কার দিবেন। কিন্তু সে সীতারাম আর নাই। যে সীতারাম হিন্দুসাম্রাজ্য সংস্থাপন জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন, সে সীতারাম রাজ্যপালন ত্যাগ করিয়া কেবল শ্রীকে খুঁজিয়া বেড়াইলেন। যে সীতারাম আপনার প্রাণ দিয়া শরণাগত বলিয়া গঙ্গারামের প্রাণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, সেই সীতারাম রাজা হইয়া, রাজদণ্ডপ্রণেতা হইয়া শ্রীর লোভে গঙ্গারামকে ছাড়িয়া দিলেন। যে লোকবৎসল ছিল, সে এখন আত্মবৎসল হইয়াছে।"

ইহা আমাদেরই বুঝাইবার কথা—গ্রন্থকার নিজেই তাহা বুঝাইয়া দিলেন।

পরে সীতারাম শ্রী পাইলেন—কিরূপে পাইলেন, পাঠকবর্গ তাহা জ্ঞাত আছেন। কিন্তু সে শ্রী ত সংসারীর শ্রী নহে—সে শ্রী ত সীতারামের শ্রী নহে—সে শ্রী ত নন্দা-রমার ন্যায় প্রণয়িনী নহে—সে শ্রী ত রক্তমাংসের শ্রী নহে। সে "স্থির মূর্ত্তি অবিচলিত ধৈর্য্যসম্পন্না, অশ্রুবিন্দুশূন্যা, উদ্ভাসিত রূপরশ্মিমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী মহিমাময়ী" দেবী, মানুষী নহে। "হায় মূঢ় সীতারাম মহিষী খুঁজিতেছিল—দেবী লইয়া কি করিবে?"

পণ্ডিতের মুখে শুনিতে পাই—এমন যে শিবপূজা, তাহাতেও অধিকারী অনধিকারী ভেদ আছে। সন্ন্যাসীর আরাধ্য শিব গৃহী আরাধনা করিলে, তাহার সর্ব্বস্ব নষ্ট হয়—বংশ থাকে না ইত্যাদি। সীতারামের বুঝি তাহাই হইল—এত সীতারামের আরাধ্যা শ্রী নহে—এ শ্রী লইলে তাঁহাকে যে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইবে। কিন্তু তাহা কি সেই সময় বুঝা যায়?

তাহাকে এতদিন হৃদয়ে আরাধ্যা দেবীর ন্যায় অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, সীতারামের সেই শ্রী আজি সম্মুখে। সীতা-

রাম; ভাবিয়াছিলেন, আজি তিনি কত সুখী হইবেন—প্রেমবৃন্দাবনে—শ্রীর চাঁদের জলে আজি তাঁহাকে অমৃতসাগরে ভাসিতে হইবে। কিন্তু সে শ্রী কি না অবিচলিত চিত্তে অশ্রুশূন্যনয়নে অপরাধীর ন্যায় সীতারামকে জিজ্ঞাসা করিল,—"এখন আমাকে কি করিতে হইবে?" সেই শ্রী কি না আজি সীতারামকে চাহিতেছেন না, বলিতেছে—"যে দিন তোমার হইতে পারিলে আমি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী হইতে চাহিতাম না, আমার সে দিন গিয়াছে।" সীতারাম বিস্মিত হইলেন—অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইলেন, কিন্তু শ্রীকে ছাড়িলেন না, কেন ছাড়িলেন না, পরে বলিতেছি।

শ্রী যাহাই হউন—সন্ন্যাসিনী পরম জ্ঞানবতীই হউন, আর ভৈরবীই হউন, সীতারামের নিকটে তাঁহার পরিণীতা ভার্য্যা শ্রী ভিন্ন আর কিছুই বিবেচিত হইতে পারেন না। সীতারাম ভাবিলেন—শ্রী কি চিরদিন এমন থাকিতে পারিবে? কখনই নহে। আর শ্রীর জ্ঞানোপদেশ কি তাঁহার হৃদয়ে কোন কার্য্য করিতে পারিয়াছিল? সীতারাম বালকের কথার ন্যায়, স্ত্রীলোকের কথার ন্যায়ই তাহা জ্ঞান করিলেন—সীতারাম আবার শ্রীর নিকট কি জ্ঞান শিক্ষা করিবেন? তাই সীতারাম শ্রীকে রাখিলেন—তাঁহার ইচ্ছামতে "চিত্তবিশ্রাম" নামে ক্ষুদ্র প্রমোদভবন শ্রীর নিবাসার্থ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

এই সময় হইতেই সীতারামের অন্তরস্থ বিষ ক্রমশঃ ক্রিয়া দেখাইতে লাগিল। সীতারাম পূর্ব্বে শ্রীকে হৃদয়ে অর্চনা করিয়াই অধীরপ্রায় হইয়াছিলেন; এখন সে শ্রী সম্মুখে—কিন্তু সীতারাম তাহাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না; সীতারামের অধীরতা ক্রমে বাড়িল। যেরূপে হইল, তাহা গ্রন্থকার এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"প্রথমে সীতারাম প্রত্যহ সায়াহ্নকালে চিত্তবিশ্রামে আসিতেন, প্রহরেক কথাবার্ত্তা কহিয়া চলিয়া যাইতেন। তারপর ক্রমশঃ রাত্রি বেশী হইতে লাগিল। পৃথক্ আসন হউক, রাজা ক্ষুধা ও নিদ্রায় পীড়িত না হইলে সেখান হইতে ফিরিতেন না। ইহাতে কিছু কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। সুতরাং সীতারাম, চিত্তবিশ্রামেই নিজের সায়াহ্ন আহার এবং রাত্রিতে শয়নের ব্যবস্থা করিলেন। সে আহার বা শয়ন পৃথক্ গৃহে; শ্রীর বাঘছালের নিকট ঘেঁসিতে পারিতেন না। ইহাতেও সাধ মিটিল না। প্রাতে রাজবাড়ী ফিরিয়া যাইতে দিনে দিন বেলা হইতে লাগিল। শ্রীর সঙ্গে ক্ষণেক প্রাতেও কথাবার্ত্তা না কহিয়া যাইতে পারিতেন না। যখন বড় বেলা হইতে লাগিল, তখন আবার মাধ্যাহ্নিক আহারও চিত্তবিশ্রামে হইতে লাগিল। রাজা আহারান্তে একটু নিদ্রা দিয়া বৈকালে একবার রাজকার্য্যের জন্য রাজবাড়ী যাইতেন। তার পর কোন দিন যাইতেন, কোন দিন বা কথায় কথায় যাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। শেষ এমন হইয়া উঠিল যে, যখন যাইতেন, তখনই একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়া আসিতেন, চিত্তবিশ্রাম ছাড়িয়া তিষ্ঠিতেন না। চিত্তবিশ্রামেই রাজা বাস করিতে লাগিলেন, কখন কখন রাজভবনে বেড়াইতে যাইতেন।

"এ দিকে চিত্তবিশ্রামে কাহারও কোন

কার্য্যের জন্য আসিবার হুকুম ছিল না। চিত্তবিশ্রামের অন্তঃপুরে কীট পতঙ্গ প্রবেশ করিতে পারিত না। কাজেই রাজকার্য্যের সঙ্গে রাজার সম্বন্ধ প্রায় ঘুচিয়া উঠিল।"

বিষ ক্রমে ক্রিয়া প্রকাশ করিতে লাগিল—ক্রমে সীতারাম একটু একটু করিয়া বিনষ্ট হইতে লাগিলেন। রাজধর্ম্ম গেল—সহধর্ম্মিণী রমা যত্নাভাবে—বুঝি তাঁহার দর্শনাভাবেই—গেল।

এই রমার মৃত্যুতে সীতারাম একটু জাগরিত হইলেন, একটু প্রকৃতিস্থ হইলেন; কিন্তু নিদারুণ ঘটনাচক্র তাঁহাকে আবার নিষ্পেষিত করিল। নন্দার নিকট, চন্দ্রচূড়ের নিকট, তিনিই রমার মৃত্যুর কারণ—এই কথা শুনিয়া সীতারাম জ্বলিয়া উঠিলেন। (বড়ই সুন্দর কাব্য—গ্রন্থের এই অংশটুকু) সীতারাম নিজেও কিন্তু তাহাই ভাবিতেছিলেন, তাহাই প্রায় স্থিরও হইয়াছিল, তবু নন্দা ও চন্দ্রচূড়ের কথায় তাঁহার ক্রোধাগ্নি যেন জ্বলিয়া উঠিল। এমন স্থলে যাহা হইবার তাহাই হইল—সীতারাম নিদারুণ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইলেন—পাপী পাপাচরণ করিতে করিতে কোন মন্দ ফল প্রাপ্ত হইলে যেমন আরও পাপ করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়, সীতারামেরও তাহাই ঘটিল। যখন লোক নিম্নের দিকে পতিত হয়, তখন জগতেরই বিধানানুসারে প্রতি পদে তাহার পতনের গতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সীতারাম নন্দাকে কড়া বলিলেন—চন্দ্রচূড়কে তিরস্কার করিলেন—আর নিদারুণ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া, রাজধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া, ঘোরতর অবিচার আরম্ভ করিলেন। এ সব কি সীতারাম করিলেন? তাহা নহে। একটা ভূত যেন সীতারামের কাঁধে চড়িয়া তাঁহার দ্বারা এই সব করাইল। "দেশে মহা হাহাকার পড়িয়া গেল। কারাগার সকল ভরিয়া গেল—বাকীদার, তহশীলদার, উভয়েই দেশ ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। যে বাকিদার নয়, সেও সঙ্গে সঙ্গে পলাইতে লাগিল।" প্রজা সব পলাইল—রাজ্য ছারখারে যাইতে লাগিল।

এ সব কেন হইল, গ্রন্থকার তাহাও নিজেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

"তাই বলিতেছিলাম, সে আগুন ত জ্বলিয়াই ছিল, এখন ঘর পুড়িল; যদি শ্রী না আসিত, তবে সীতারামের এতটা অবনতি হইত কি না জানি না; কেননা, সীতারাম ত মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, যে রাজ্যশাসনে মন দিয়া শ্রীকে ভুলিবেন—সে কথা যথাস্থানে বলিয়াছি। অসময়ে আসিয়া শ্রী দেখা দিল, সে অভিপ্রায় বালির বাঁধের মত আসক্তির বেগে ভাসিয়া গেল। রাজ্যে মন দিলেই যে সব আপদ্ ঘুচিত, তাহা নাই বলিলাম; কিন্তু শ্রী যদি আসিয়াছিল, তবে সে যদি নন্দার মত রাজপুরী মধ্যে মহিষী হইয়া থাকিয়া, নন্দার মত রাজার রাজধর্ম্মের সহায়তা করিত, তাহা হইলেও সীতারামের এতটা অবনতি হইত না বোধ হয়। কেবল ঐশ্বর্য্যমদে যে অবনতিটুকু হইয়াছিল, শ্রী ও নন্দার সাহায্যে সে টুকুরও কিছু খর্ব্বতা হইত। তা শ্রী, যদি রাজপুরীতে মহিষী না থাকিয়া চিত্তবিশ্রামে আসিয়া উপপত্নীর মত রহিল, তবে সন্ন্যাসিনীর মত না থাকিয়া, সেই মত থাকিলেই

এতটা ঘটিত না। আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইলে তাহার মোহিনী শক্তির অনেক লাঘব হইত। কিছু দিনের পর রাজার চৈতন্য হইতে পারিত। তা, যদি শ্রী সন্ন্যাসিনী হইয়াই রহিল, তবে সোজা রকম সন্ন্যাসিনী হইলেও এ বিপদ্ হইত না। কিন্তু এই ইন্দ্রাণীর মত সন্ন্যাসিনী বাঘছালে বসিয়া বাক্যে মধুবৃষ্টি করিতে থাকিবে, আর সীতারাম কুকুরের মত তফাতে বসিয়া মুখপানে চাহিয়া থাকিবে—অথচ সে সীতারামের শ্রী! পাঁচ বৎসর ধরিয়া সীতারাম তাহার জন্য প্রাণপাত করিয়াছিলেন! এ দুঃখের কি আর তুলনা হয়! ইহাতেই সীতারামের সর্ব্বনাশ ঘটিল।"

শেষে শ্রী পলাইল—রাজা সীতারাম কামনা পূরাইতে পারিলেন না। শ্রীকে অনুদিন দেখিয়া দেখিয়া হৃদয়ে যে কামানল জলিতেছিল, তাহা নির্ব্বাপিত হইতে পারিল না—রাজা দারুণ ক্রোধে মাতিয়া গেলেন। পূর্ব্বেই 'ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে—সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ—দেখিয়াছি। এখন কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে' দেখিলাম। ধার্ম্মিক রাজা সীতারাম জয়ন্তীকে উলঙ্গ করিয়া বেত্রাঘাতের আদেশ দিলেন—ক্রোধ হইতে সম্মোহ জন্মিল; সম্মোহ হইতে নীতিভ্রষ্ট হইতে লাগিলেন। জয়ন্তীকে নন্দা রক্ষা করিলেন—আবার কামনা প্রতিহত হইয়া ক্রোধ জন্মিল। গ্রন্থকার লিখিলেন,—

"এখন তাহার চিত্তে ক্রোধই প্রবল—সে ক্রোধ সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বগ্রাসক। অন্যকে ছাড়িয়া ক্রোধ শ্রীর উপরেই অধিক প্রবল হইল।"

বুঝি শ্রীর উপর ক্রোধাধিক্যই—ভ্রমরের প্রতি গোবিন্দলালের ক্রোধের ন্যায়—তাঁহাকে পরবর্ত্তী কার্য্যে নিয়োজিত করিল। অথবা অতৃপ্ত ভোগলালসা, শ্রীকে না পাইয়া, চারিদিক ছুটিয়া উঠিল। ধার্ম্মিক সীতারাম পশুর ন্যায় আজ্ঞা করিলেন,—"রাজ্যে যেখানে যেখানে যে সুন্দরী স্ত্রী আছে, আমার জন্য চিত্তবিশ্রামে লইয়া আইস।" ক্রোধ হইতে সম্মোহ, সম্মোহ হইতে আত্মবিস্মৃতি ও নীতিবিস্মৃতি, ইহা হইতে বুদ্ধিনাশ ঘটিল। বুদ্ধিনাশ হইতে সীতারাম বিনষ্ট হইলেন—সে সকল কথা পাঠকবর্গ জ্ঞাত আছেন।

এখন একবার সীতারামের চরিত্রটী মোটের উপর সমালোচনা করা যাউক। সীতারামকে আমরা প্রথমে দেখিলাম—একটী ধর্ম্মবীর—হাঁ ধর্ম্মবীর বৈ কি। হিন্দুকে মুসলমানের অত্যাচার হইতে রক্ষা করা যাঁহার জীবনের ব্রত, তিনি ধর্ম্মবীর নয় ত কি? প্রাণপাত করিয়া, শত সহস্র বিপদ পায়ে ঠেলিয়া, শরণাগতের প্রাণ বাঁচাইতে যিনি একদিন উদ্যত ছিলেন, তাঁহাকে ধর্ম্মবীর বলিব না তবে কি বলিব? যাঁহার স্থাপিত সাম্রাজ্যে সেই সময়কার হিন্দুমুসলমানে প্রীতি ছিল, তাঁহাকে ধার্ম্মিক বলিব না তবে কি বলিব? হিন্দুর প্রধান চন্দ্রচূড়, মুসলমানের প্রধান চাঁদশাহ ফকির—উভয়েই যাঁহার কল্যাণ কামনা করিতেন, তাঁহাকে কি সামান্য মানব মনে কর? সীতারাম সামান্য লোক ছিলেন না—সামান্য লোকের পতন দেখাইতে কবি উপন্যাস রচনা করেন না। তাঁহার নগেন্দ্রনাথ,

তাঁহার গোবিন্দলাল, ধর্ম্মবীর সীতারামের পদপ্রান্তে পড়িয়া থাকিতে পারে। এ হেন ধর্ম্মবীরেরও পশুবৎ পতন দেখিলে!—সীতারামের যেরূপ পতন দেখিলে, নগেন্দ্রনাথ গোবিন্দলালেরও বুঝি তদ্রূপ পতন হয় নাই! আর্য্য কবির ইহাই অভিপ্রেত। সামান্য, অতি সামান্য কারণে, সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম পাপে, সীতারামের পতন ঘটিয়াছিল—আমরা তাহা ক্রমে দেখাইতেছি।

প্রথমে স্থূলভাবে সীতারামের চরিত্র দেখ। সীতারামের প্রথম পাপ কি?—না পরিণীতা পত্নীত্যাগ। পরিণীতা ভার্য্যাকে পিতৃ-আজ্ঞায় পরিত্যাগ করিয়া, সীতারাম তাহার প্রায়শ্চিত্ত জন্য রাজ্যসুখ বিসর্জ্জন দিতেও প্রস্তুত। এতেও কি কি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল না? শ্রীর জন্য সীতারাম কি না করিয়াছেন? অমন নন্দা ও রমাকেও প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছেন—অমন রাজার আধিপত্য, রাজার ভোগ, এমন কি রাজ্য পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন—ইহাতেও কি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই? তারপরে দেখ, সীতারাম শ্রী পাইলেন; কিন্তু যে শ্রী পাইলেন, তাহা তাঁহাতে শোভিল না—সে সন্ন্যাসীর শ্রী রাজার গৃহে শোভিবে কেন? ইহাতে সীতারামের দোষ বলিবে কি? সীতারাম শ্রীকে ত পাইয়াছিলেন, তবে তাহাকে নন্দা ও রমার মত রাখিলেই পারিতেন—না হয় দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু সীতারাম ইহার প্রথমটি পারেন নাই শ্রীর জন্য; দ্বিতীয়টি পারেন নাই—আশার আশায়—অতৃপ্ত ভোগলালসায়। তবেই সীতারামের দোষ হইল? তাহা নহে। স্বীয় পরিণীতা ভার্য্যার প্রতি কামনা-পরতন্ত্র হওয়া কি সংসারীর অধর্ম্ম? কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহার নিষেধ দেখাইতে পার? সাধ্বী, পতিব্রতা দেবী স্ত্রীর সহবাসে কি অধর্ম্ম দেখাইবে? এ যদি অধর্ম্ম, তবে বিবাহ কেন? তবে সংসার কেন? ফল কথা, সীতারাম ভাসিলেন—ঘটনার স্রোতে। শ্রীই তাঁহার পতনের মূল—তাঁহার দোষ নাই—গ্রন্থকার সত্যই লিখিয়াছেন।

যদি এইখানেই সীতারামকে বিদায় দিতে পারিতাম, তবে মনে বুঝি কতকটা শান্তি হইত। কিন্তু তাহা হইবার নহে—সীতারামের অমন পতনে কেবল ঘটনাচক্র বা দৈব কারণ দেখিয়া মন স্থির হইতে চাহে না। সীতারামের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া, স্পষ্টই হউক, আর যাহাই হউক, একটা বীজ বাহির হইতেছে। সে কথাটি এই:—

ভগবান্ বলিয়াছেন যে,—

"ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি।"

সংসারীর পক্ষে ইন্দ্রিয়-দমন একান্ত আবশ্যক। ইহা যে কেবল মাত্র সন্ন্যাসীরই অনুষ্ঠেয়, তাহা নহে—সংসারীরও ইন্দ্রিয়দমন না হইলে তাহার পতন অনিবার্য্য। ফল কথা, পাকা সন্ন্যাসী না হইলে পাকা সংসারী হওয়া যায় না। সীতারাম প্রথমে পরদারনিরত ছিলেন না সত্য, সীতারাম লোভীও না থাকিতে পারেন, সীতারামের অন্য রিপু বশে থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু কাম রিপু তাঁহার বশে ছিল না। কেবলমাত্র পরদারগমন না করি-

সেই এই ইন্দ্রিয়দমন হইয়াছে, এইরূপ অনেকে মনে করেন; কিন্তু তাহা ভুল এবং কবি সীতারাম-চরিত্রে সেই ভুলও দেখাইয়া দিতেছেন।

শ্রী একদিন সীতারামকে বলিয়াছিল,—"ধর্ম্মার্থে ভিন্ন যে ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি তাহা অধর্ম্ম। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি পশুবৃত্তি। পশুবৃত্তির জন্য বিবাহের ব্যবস্থা দেবতা করেন নাই। পশুদিগের বিবাহ নাই। কেবল ধর্ম্মার্থেই বিবাহ। রাজর্ষিগণ কখন বিশুদ্ধচিত্ত না হইয়া সহধর্ম্মিণীর সহবাস করিতেন না। ইন্দ্রিয়-বশ্যতা মাত্রই পাপ।" সীতারাম এ কথা বুঝেন নাই, বুঝিতে চাহেন নাই, বিশ্বাস করেন নাই, বিশ্বাস করিতে চাহেন নাই। এই তাঁহার পাপ। এই পাপেই তাঁহার পতন হইল। রূপোন্মাদ তাঁহার প্রথমেই ছিল—সে বীজটুকু আমরা প্রথম দিনেই সীতারামে দেখিতে পাইয়াছি। শ্রীর সহিত সীতারামের প্রথম কথা—প্রথমদো সীতারামের প্রথম কথা—"তুমি শ্রী এত সুন্দরী!" যাহা আরম্ভে দেখিলাম, উপসংহারেও তাহাই দেখিলাম। আরম্ভে যাহার অঙ্কুর দেখিয়াছিলাম, শেষে তাহার বৃক্ষ দেখিলাম। এটুকু কবির অসামান্য কবিত্ব। আমরা বরাবরই দেখিয়াছি যে, কবি চরিত্রের প্রথমেই তাহার একটা এমন পরিচয় দিয়া থাকেন যে, শেষ পর্য্যন্ত তাহা আমরা ভুলিতে পারি না। হউক না শ্রী সীতারামের স্ত্রী—কিন্তু যে স্বামী স্ত্রীকে দেখিয়া প্রথম কথাই এই বলে "তুমি এমন সুন্দরী," তাহার অন্য রিপু বশীভূত হইয়া থাকিলেও রূপ যে রিপুর অস্ত্র, সে রিপু তখন যায় নাই। পরে দেখিলাম, সীতারাম যখন যে ভাল কার্য্যটিও করিয়াছেন, এইরূপ তৃষ্ণা মিটাইবার ইচ্ছা অলক্ষ্যে এক প্রবল কারণ হইয়া তাঁহার অন্তরে কার্য্য করিয়াছে। কেবল কি অনুষ্ঠান ভাল হইলেই হইল? তাহা নহে। তাহাতে ফলস্পৃহা, আসক্তি না থাকা চাই। সীতারাম যাহা করিয়াছেন, সকাম হইয়া করিয়াছেন। গঙ্গারামকে মুসলমানের হস্ত হইতে তিনি রক্ষা করেন, শ্রীর মনস্তুষ্টির জন্য; রাজদণ্ড হইতে রক্ষা করেন, শ্রীকে পাইবার জন্য। থাকুক তাহাতে অন্য আবরণ—আবরণ ত থাকিবেই, কবির যখন তাঁহার হইয়া ওকালতি করিতে হইয়াছে, তখন অত সহজে তাহা দেখিতে পাইবে কেন, তাহা হইলে কবিত্ব থাকে না—কিন্তু সে আবরণমধ্যে শ্রীর রূপভোগতৃষ্ণাটাও নিহিত ছিল। সেই তৃষ্ণাই—ভার্য্যাসম্ভোগের, সেই তৃষ্ণাই—সীতারামের পতনের কারণ। যেমন ঘটিকাযন্ত্রের একটী চক্র ঘূর্ণিত করিয়া দিলেই সম্বন্ধ নিবন্ধন সমস্ত চক্র ঘুরিতে থাকে এবং সেই প্রথম ঘূর্ণিত চক্রও আবার ঘূর্ণিত হয়; যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে ফল, আবার ফল হইতে বীজ জন্মে; সেইরূপ তাঁহার সেই তৃষ্ণা হইতে আসক্তি, ক্রোধ, মোহ, স্মৃতিবিভ্রম, বুদ্ধিনাশ, আবার বুদ্ধিনাশ হইতে তৃষ্ণা জন্মিতে লাগিল। বড়ই অপূর্ব্ব এ চক্রঘূর্ণন! তখন সীতারাম ঘটিকাযন্ত্রের ন্যায় চালিত হইতেছিলেন—কেহ তাঁহার গতিরোধ করিতে পারে নাই। শ্রীর রূপ দেখিয়া তাহার ধ্যান, ধ্যান হইতে তাহাতে আসক্তি, আসক্তি হইতে তাহার লালসা, লালসা প্রতিহত হইলে ক্রোধ, ক্রো

হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ, আবার তাহা হইতে তৃষ্ণা, ইত্যাদি বা এতদূর না আসিয়াও তৃষ্ণা হইতে ক্রোধ, আবার ক্রোধ হইতে তৃষ্ণা চলিতে লাগিল। শেষে যেমন ঘটিকাযন্ত্রে স্প্রীংয়ে জোর না থাকিলে তাহা চলিতে পারে না, সীতারামও সেইরূপ আর চলিতে পারিলেন না। যতদূর চলিবার চলিয়াছিলেন; আর যাইতেনই বা কোথায়? *

সীতারামের চরিত্রসম্বন্ধে এইখানেই বক্তব্য শেষ হয়। সীতারামের এরূপ তৃষ্ণা কোথা হইতে আসিল, ঘটনা-চক্রে তাহা কেন পরিবর্দ্ধিত হইল, তাহা ব্যাখ্যা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে—কারণ উপন্যাসেরও তাহা উদ্দেশ্য নহে।

এখন উপসংহারে সীতারাম চরিত্র হইতে আর একটী তত্ত্ব দেখাইতে ইচ্ছা করি। সেটি সীতারামের পুনরুত্থান। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহারা ঘটনা-ক্রমে পাপী হইয়া পূর্ণমাত্রায় পাপাচরণ করিতে পারে, তাহাদের এমনই এক ঘটনা ঘটিয়া থাকে, যাহাতে আবার তাহাদের পুনরুত্থান-শক্তি জন্মে। অনন্তকাল পাপাচরণ কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। আর বুঝি একের চরম প্রান্তে অপর বিদ্যমান থাকে। তাই বুঝি সীতারাম যখন সব শেষ করিলেন, তখন তাঁহার চৈতন্য হইল।

ঘটনাচক্রও তখন অনুকূলে বহিল। জয়ন্তী যখন বলিল—"মহারাজ! নিরুপায়ের এক উপায় আছে—আপনি কি তাহা জানেন না? জানেন বৈ কি? জানিতেন, জানিয়া ঐশ্বর্য্যমদে ভুলিয়া গিয়াছিলেন—এখন কি সেই নিরুপায়ের উপায় অগতির গতিকে মনে পড়ে না?"

"সীতারাম মুখ নত করিলেন। তখন অনেক দিনের পর, সেই নিরুপায়ের উপায়, অগতির গতিকে মনে পড়িল। কাল কাদম্বিনী বাতাসে উড়িয়া গেল—হৃদয় মধ্যে অল্পে অল্পে, ক্রমে ক্রমে সূর্য্যরশ্মি বিকশিত হইতে লাগিল—চিন্তা করিতে করিতে অনন্তব্রহ্মাণ্ডপ্রকাশক সেই মহাজ্যোতিঃ প্রভাসিত হইল। তখন সীতারাম মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—নাথ! দীননাথ! অনাথনাথ! নিরুপায়ের উপায়! অগতির গতি! পুণ্যময়ের আশ্রয়! পাপিষ্ঠের পরিত্রাণ! আমি পাপিষ্ঠ বলিয়া আমায় কি দয়া করিবে না?"

"সীতারাম অনন্যমনা হইয়া ঈশ্বর চিন্তা করিতেছেন দেখিয়া শ্রীকে জয়ন্তী ইঙ্গিত করিল। তখন সহসা দুইজনে মঞ্চের উপর জানু পাতিয়া বসিয়া, দুই হাত যুক্ত করিয়া, ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া, ডাকিতে লাগিল—গগনবিহারী গগনবিদারী কল-বিহঙ্গনিন্দিত কণ্ঠে, সেই মহাদুর্গের চারিদিগ প্রতিধ্বনিত করিয়া ডাকিতে লাগিল,—

"ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং
নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং
বিশ্বমনন্তরূপ॥"

"দুর্গের বাহিরে সেই সাগরগর্জ্জনবৎ মুসলমান সেনার কোলাহল; প্রাচীর

---

* কবি সী ... পতনের কারণ মধ্যে উঁহার ঐশ্বর্য্যমদ একটা কারণ স্থির করিয়াছেন। দুইস্থলে তিনি ইহার উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা দেখিয়াছি। আমরা তাহার কার্য্য ভাল দেখিতে পাই নাই বলিয়া [illegible] উল্লেখ করি নাই। তবে ঐরূপ একটা কারণ থাকা সম্ভব বটে। [illegible]

ভেদার্থ প্রক্ষিপ্ত যামানের ভীষণ নিনাদ, মাঠে মাঠে, জঙ্গলে জঙ্গলে, নদীর বাঁকে বাঁকে, প্রতিধ্বনিত হইতেছে ; দুর্গমধ্যে জনশূন্য, সেই প্রতিধ্বনিত কোলাহল ভিন্ন শব্দশূন্য—তাহার মধ্যে সেই সাক্ষাৎ জ্ঞান ও ভক্তিরূপিণী জয়ন্তী ও শ্রীর সপ্তস্বরসম্বাদিনী অতুলিত কণ্ঠনিঃসৃত মহাগীতি আকাশ বিদীর্ণ করিয়া, সীতারামের শরীর রোমাঞ্চিত করিয়া, ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল,—

"নমো নমোঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব

শুনিতে শুনিতে সীতারাম বিমুগ্ধ হইলেন—আসন্ন বিপদ ভুলিয়া গেলেন ; যুক্তকরে ঊর্দ্ধমুখে বিহ্বল হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন ; তাঁহার চিত্ত আবার বিশুদ্ধ হইল।

এমনটি কিন্তু (অদৃষ্টবান্ না হইলে) তোমার আমার ঘটে না—সীতারামের ন্যায় ধর্ম্মশীলেরই এইরূপ ঘটিতে পারে।

সীতারাম-চরিত্রের আর একটি ভাব বিশ্লেষণ করিলেই—আমরা যতদূর বুঝি, তাঁহার চরিত্রের সবই দেখা হয়। সেটি শ্রীর প্রতি তাঁহার আসক্তি।

শ্রীর প্রতি সীতারামের আসক্তি সম্বন্ধে ভক্তিভাজন গ্রন্থকারের সহিত আমাদের একটু মতভেদ আছে, অথবা মতভেদ বলি কেন—গ্রন্থকারের তৎসৃষ্ট চরিত্র-সম্বন্ধীয় মন্তব্য পাঠকের বিশ্বাস করা উচিত নহে ; কারণ, দুই এক স্থলে তাহা গ্রন্থকারের অভিপ্রায় মতেই পাঠককে মনোহর বাক্-বিন্যাসে ভ্রান্তিনিজড়িত করিয়া থাকে। এই ভ্রান্তি-বিস্তারে কবির বাহাদুরী আছে—সুতরাং এ লোভ সহজে পরিত্যাজ্য নহে। সীতারামের চরিত্রের দোষগুণ আলোচনা-স্থলে আমরা কবির এইরূপই একটি মধুর মন্তব্য পাঠ করিয়াছি। এইরূপ মন্তব্য দুই এক স্থলে ঠিক্ 'ম্যাক্‌বেথের' ডাকিনীর কথার মত—দুইই উহাতে থাকে, সত্যও থাকে এবং একাধারে মিথ্যাও থাকে ; কারণ, তাহার যে অর্থ শ্রোতা প্রথমে গ্রহণ করেন, সে অর্থ প্রকৃত নহে।

শ্রীর প্রতি সীতারামের আসক্তিতে নির্দ্দোষ দশটা কারণ বিদ্যমান থাকিলেও, একটা দোষযুক্ত কারণও ছিল—সেটা শ্রীর শারীরিক রূপ জন্য সীতারামের ইন্দ্রিয়-তৃষ্ণা বা মোহ। গ্রন্থকার সীতারামের প্রথম কথাতেই তাহা অতি বিশদরূপে ব্যক্ত করাইলেন—শেষের ঘটনাতেও তাহা অতি প্রকৃষ্টরূপেই প্রকাশ করাইলেন ; কিন্তু এমনই তাঁহার সীতারামের প্রতি স্নেহ বা কাব্যসংরক্ষণের চেষ্টা যে, তাহার মন্তব্য-মধ্যে তাহা কোন স্থানেই সুপ্রকাশিত দেখিতে পাইলাম না। তিনি কি উহা বলেন নাই ? তাহা নহে ; বলিয়াছেন ; কিন্তু সমালোচক যেরূপ বলেন, সেরূপ বলেন নাই—কবি যেরূপ বলেন, সেইরূপ বলিয়াছেন। তাই, কবির সেই মন্তব্যগুলি একটু যত্নসহকারে পড়িতে হয়।

শ্রী সীতারামের বাল্যসহচরী নহে—তাহার সহিত বিবাহ হইয়া থাকিলেও আদৌ আলাপ-ব্যবহার ছিল না। এরূপ স্থলে, হঠাৎ একদিন দেখিয়া ধার্ম্মিক সীতারাম এত যে মোহিত হইলেন, তাহার কারণ ? কবি তাহার এক সুন্দর উত্তর করিয়াছেন। দেখা যায় তাল-

বাসা হয়, এ ধারণা কবির নাই। তাঁহার কোন চরিত্রেই তাহা দেখিতে পাইবে না। এ সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টি প্রথম হইতেই দেখিতে পাই। যেখানেই তিনি প্রণয়ের—প্রকৃত প্রণয়ের মূর্ত্তি দেখাইয়াছেন, সেইখানেই দেখিবে—প্রণয়িযুগলের মধ্যে প্রায়ই বিবাহ সম্বন্ধ ঘটাইয়া পরে প্রণয়—বদ্ধ করিয়াছেন। যেখানে তাহা না দেখিবে, সেইখানে হয় বিবাহ ভিন্ন অন্য প্রকার সম্বন্ধ (যথা বাল্যসংসর্গ প্রভৃতি) কারণরূপে দেখিতে পাইবে, নতুবা জানিবে যে, সে প্রণয়ের কলুষিত ভাব দেখানই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। যাঁহারা একটু মনোযোগ করিয়া আমাদের কবির উপন্যাসগুলি পড়িয়াছেন, তাঁহারাই একথা জানেন—আমরা এস্থলে দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা দেখাইবার আবশ্যকতা দেখিলাম না। এখানেও তিনি বলিতেছেন,—

"ভালবাসা কি স্নেহ, যাহা সংসারে এত আদরের, তাহা সুধু গুণেরই প্রাপ্য, নূতনের প্রতি জন্মে না। যাহার সংসর্গে অনেক কাল কাটাইয়াছি, বিপদে সম্পদে, সুদিনে দুর্দিনে, যাহার গুণ বুঝিয়াছি, সুখ দুঃখের বন্ধনে যাহার সঙ্গে বদ্ধ হইয়াছি, ভালবাসা বা স্নেহ তাহারই প্রতি জন্মে।"

তবে সীতারামের উপায়? সীতারাম শ্রীর জন্য যে উন্মত্ত, তাহা ত দেখিয়াছি। সে উন্মত্ততাই যে এক প্রকার পাপ, তাহাও দেখাইয়াছি। যাহা হউক, যদি প্রকৃত ভালবাসায় সেই উন্মত্ততা হয়, না হয়, সংসারীর চক্ষে সে পাপকে কিছু লঘু করিয়াই দেখিলাম। কিন্তু গ্রন্থকার ত সে পথেও বিঘ্ন সৃষ্টি করিলেন; বলিলেন, প্রকৃত ভালবাসা শ্রীর ন্যায় স্ত্রীর প্রাপ্য নহে। অথচ ত একটা দোষের কথা না আসিয়া থাকিতে পারে না। তাই কবি তাঁহার অদ্ভুত কৌশলবলে—সীতারামের প্রতি তাঁহার অদ্ভুত স্নেহবলে, একটা কারণ উপস্থিত করিলেন; আমরা পড়িয়া বিস্মিত, স্তম্ভিত, পুলকিত ও রোমাঞ্চিত হইলাম। পাঠক! প্রবন্ধ মনোহর করিবার জন্য এই বিশেষণগুলি প্রয়োগ করিলাম না—যাহা সত্য তাহাই লিখিলাম।

কবি লিখিলেন,—

"কিন্তু নূতন, আর একটি সামগ্রী পাইয়া থাকে। নূতন বলিয়াই তাহার একটা আদর আছে। কিন্তু তাহা ছাড়া আরও আছে। তাহার গুণ জানি না, কিন্তু চিহ্ন দেখিয়া অনুমান করিয়া লইতে পারি। যাহা পরীক্ষিত, তাহা সীমাবদ্ধ; যাহা অপরীক্ষিত কেবল অনুমিত, তাহার সীমা দেওয়া না দেওয়া মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে। তাই নূতনের গুণ অনেক সময়ে অসীম বলিয়া বোধ হয়। তাই সে নূতনের জন্য লালসা দুর্দ্দমনীয় হইয়া পড়ে। যদি ইহাকে প্রেম বল, তবে সংসারে প্রেম আছে। সে প্রেম বড় উন্মাদকর বটে। নূতনেরই তাহা প্রাপ্য। তাহার টানে পুরাতন অনেক সময় ভাসিয়া যায়। শ্রী সীতারামের পক্ষে নূতন। শ্রীর প্রতি সেই উন্মাদকর প্রেম সীতারামের চিত্ত অধিকৃত করিল। তাহার স্রোতে নন্দা রমা ভাসিয়া গেল।"

"হায় নূতন! তুমিই কি সুন্দর? না, সেই পুরাতনই সুন্দর? তবে, তুমি নূতন! তুমি অনন্তের অংশ। অনন্তের

একটুখানি মাত্র আমরা জানি। সেই একটুখানি আমাদের কাছে পুরাতন। অনন্তের আর সব আমাদের কাছে নূতন। অনন্তের যাহা অজ্ঞাত তাহাও অনন্ত। নূতন তুমি অনন্তেরই অংশ। তাই তুমি এত উন্মাদকর। শ্রী, আজ সীতারামের কাছে অনন্তের অংশ।”

দেখ, মাত্রা কতদূর উঠিল!

শতমুখেও তুমি ইহার সবিশেষ ব্যাখ্যা হইতে পারে না। কথাটা এমনই সত্য যে, যেই ইহা পড়িবে, তাহাকেই প্রথমে মস্তক নত করিয়া সীতারামের স্কন্ধ হইতে আমাদের পূর্ব্বোক্ত দোষগুলি নামাইয়া দিতে হইবে। তাহাকে ভাবিতে হইবে যে, শ্রীর প্রতি সীতারামের এই যে আসক্তি তাহা নূতন প্রীতি হইলেও দূষিত নহে। কবি এইরূপে সীতারামের পাপ স্খলন করিবার জন্য অত্যন্ত চেষ্টা করিয়াছেন—শ্রীর প্রতি তাঁহার আসক্তিতে রূপোন্মাদ দোষটা একেবারেই প্রচ্ছন্ন অথবা চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় অধর্ত্তব্য বলিয়া রাখিতে সমস্ত প্রতিভা নিয়োজন করিয়াছেন। কেবল যে এই স্থলেই তাহা করিয়াছেন, তাহা নহে—এক স্থলের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি—এক স্থল এই বলিতেছি—আর এক স্থল পরে দেখাইব।

আমরা তুই চারিবার তাঁহার কথার প্রথমার্থে ভুলিয়া না গিয়াছি, তাহা নহে; কিন্তু পরে সে ভুল রহিতে পারে নাই। ভুল রহে নাই সত্য, কিন্তু তাহাতে কি গ্রন্থকারের প্রতি সেই ভুলাইবার চেষ্টা জন্য বিরক্ত হইয়াছি? কণামাত্রও নহে। পূর্ব্বে ভুলিয়াও সুখী হইয়াছিলাম, পরে ভুল অপসারিত হওয়াতে আরও সুখী হইলাম। দেখিলাম, কবির কি অদ্ভুত ক্ষমতা। এরূপ সত্য কথা দ্বারা ওকালতি জগতে কয় জনে করিতে পারেন?

নূতনত্বের সম্বন্ধে কবি যাহা বলিলেন, তাহা ঠিক। কিন্তু তাহাতে রূপের কথাটা ত গেল না। যাহার ভালবাসা নাই, সেও নিত্য নূতন সৌন্দর্য্য ভোগের জন্য লালায়িত হইয়া থাকে—যেমন সীতারাম লালায়িত, ঠিক সেইরূপই লালায়িত হইয়া থাকে। ঘরে যাহার সাক্ষাৎ রতি বিরাজিতা—এরূপ লোককেও অপর সুন্দরী রমণীর ভোগ-তৃষ্ণায় আকুল দেখিয়াছি। সেটাকে কি সমর্থন করা যায়? তাহা নহে। বাস্তবিক পক্ষে শ্রীর প্রতি সীতারামের যে আসক্তি তাহাতে প্রথমে রূপ—পরে গুণ কারণ-রূপে ক্রীড়া করিতেছিল। গুণের যে মোহ, তাহাও রূপ হইতে সঞ্জাত—“সিংহবাহিনী মূর্ত্তি” স্মরণেও রূপ প্রথমে, গুণ পরে। কবি তাহা অতি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। কিন্তু মন্তব্যটি পড়িলে যেন বোধ হয়, সীতারামের উহাতে কোন দোষই ছিল না। অথচ মন্তব্য সম্পূর্ণ সত্য—এক বর্ণও মিথ্যা নহে। কবি সব কথাই ভাবিয়া চিন্তিয়া, কথা বজায় রাখিয়া, অথচ কাব্য জমাইয়া, মন্তব্যটি লিখিলেন। পাঠক, এমন সত্য কবিত্ব কল দেখি, এমন কাব্য আর কোথাও দেখিয়াছ কি?

সীতারামকে মূলে পাপী করিলে কাব্যই থাকে না; অথচ সীতারামের কর্ম্ম ও পরিণাম যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপই বজায় রাখা চাই—নতুবা উদ্দেশ্য থাকে না, তাই কবি স্থানে স্থানে আমাদিগকে কুহকজালে আবৃত করিয়াছেন। শ্রী

লোচকগণ বলেন, এই কুহকই শ্রেষ্ঠ কাব্য।

আর এক স্থলে দেখ—

কবি লিখিতেছেন—"শেষ সীতারাম স্থির করিলেন, শ্রীর প্রতি বলপ্রয়োগ করিবেন।" কথাটি শুনিয়া তোমার আমার প্রথমে কিছু বিস্ময় হইল—কারণ গ্রন্থকারই একস্থলে লিখিয়াছেন—"একে ভালবাসা বলে না—তাহা হইলে গঙ্গারাম কখন রমাকে ভয় দেখাইয়া, যাহাতে তাহার যন্ত্রণা বাড়ে, তাহা করিয়া যাইতে পারিত না। এ একটা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট চিত্তবৃত্তি—যাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে, তার সর্ব্বনাশ করিয়া ছাড়ে। এই গ্রন্থে তাহার প্রমাণ আছে।" যাহার প্রতি বল-প্রয়োগ করিতে হইবে, নিশ্চয়ই তাহাকে যন্ত্রণা দিতে হইবে। তখন তাহার প্রতি ভালবাসার অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। তাই গ্রন্থকার আবার লিখিতেছেন,—

"তবে যাকে ভালবাসে, তাহার উপর বল প্রয়োগ বড় পামরও পারে না। শ্রীর উপর রাজার যে ভালবাসা, তাহা এখন কাজেই ইন্দ্রিয়-বশতায় আসিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ভালবাসা এখনও যায় নাই। তাই বল-প্রয়োগে ইচ্ছুক হইয়াও সীতারাম তাহা পারিতেছিল না। বল-প্রয়োগ করিব কি না,—এ কথার মীমাংসা করিতে সীতারামের প্রাণ বাহির হইতেছিল। যত দিন না সীতারাম একটা এদিক্ ওদিক্ স্থির করিতে পারিলেন, তত দিন সীতারাম এক প্রকার জ্ঞানশূন্যাবস্থায় ছিলেন। সেই সময়ে বুদ্ধি-বিপর্য্যয়ে পাপপুরুষেরা খুলে গেল—রাজ্য ছারে খারে যাইতে লাগিল।"

দেখিলে—সীতারামকে তোমাদের নিকট কিরূপ প্রতিপন্ন করিতে কবি চেষ্টা করিতেছেন! সীতারাম শ্রীর প্রতি বল-প্রয়োগের চেষ্টা করিতেছেন, তবু কবি তাঁহার সেই দোষক্ষালনের কত চেষ্টা করিলেন। সে দোষ কেন, সেই দোষকে ভিত্তি করিয়া আরও দশটা দোষক্ষালনের চেষ্টা হইল। সীতারাম যদি ঐ সময়ে আত্মজিজ্ঞাসু হইতেন, তবে এই রকমই তর্ক বিতর্ক করিতেন—জগতে কত শত শিক্ষিত পাপী এইরূপ পাপ সূক্ষ্ম করিয়া আত্মবঞ্চনা করিতে চাহে; কবি তাহাই তোমাদিগকে বলিলেন, বুঝাইলেন—কিন্তু সরলভাবে নহে। অথচ তুমি সরলভাবেও একটা কিছু বুঝিলে—ঐ চাতুর্য্যে এইরূপ সরলতার আবরণ থাকিলে, কাব্য-চাতুর্য্যই প্রস্ফুটিত হয়।

সীতারামের আসক্তির যে টুকু ভাল অংশ (যদি আসক্তির কিছু ভাল থাকিতে পারে), সীতারাম যেটুকু সহ্য করিয়াছিলেন—যেটুকু আত্মদমন করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা আমরা দেখাইতে চাহি না; কারণ, সে পক্ষে কবির প্রখর দৃষ্টিই রহিয়াছে। আমরা কেবল সীতারামের চরিত্রের দোষভাগই প্রদর্শন করিলাম। কারণ, কবির তাহা মুখ্য লক্ষ্য হইলেও, তাহা কাব্যঘটায় কিছু প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। যাহা প্রচ্ছন্ন, তাহারই প্রদর্শন আমাদিগের মুখ্য কার্য্য।

সীতারামের পাপপুণ্য সমালোচনা শেষ হইল। আমরা দেখিলাম, সীতারাম তোমার আমার ন্যায় সামান্য মানুষ নহে—আমরা দেখিলাম, সীতারামের পাপের প্রকৃতি তোমার আমার অনুচিত

পাপের মত নহে—আমরা দেখিলাম, সীতারামের অধঃপতন তোমার আমার ন্যায় অধঃপতন নহে। পাপ ছোট, লোক বড়; অথচ পতন কেন এত বড় হইল, জানিতে চাহ কি? এ কথা একদিনে আমরা "চন্দ্রশেখর" ও "আর্থার ও গুইনিবিয়ার" পুস্তকদ্বয় তুলনায় বলিয়াছি, আজ এখানে অতিরিক্ত দুই একটি মাত্র কথা বলিব। সীতারামের ঐরূপ পতনকে ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলিলে দোষ কি? ঐরূপ পড়িলেন দেখিয়াই, সীতারামকে ভগবান্ আবার কোলে তুলিলেন—ঐরূপ পড়িলেন বলিয়াই, সীতারামের আবার উত্থানশক্তি জন্মিল। নতুবা তুমি আমি যে অনুদিন তিল তিল করিয়া পতিত হইতেছি সেই রকম পড়িলে সীতারাম আর উঠিতেও পারিতেন না। দেখিলাম—যেমন ঘটনাচক্রে তাঁহাকে পাতিত করিয়াছে, তেমনই ঘটনাচক্রে আবার তাঁহাকে উঠাইয়াও দিয়াছে! ঐ উত্থান ও পতন উভয়ই সুন্দর! ঐ পতনে সীতারামের যাহা পাপ তাহা বলিয়াছি—বিবাহিতা ভার্য্যায় প্রতি ভোগলালসা। তাহাতে কি এমন পতন হয়? তোমার আমার ত হয় না! হইবে কেন?—তোমার আমার কি ঘরে শ্রী আছে যে, ঐরূপ পতন ঘটিবে? পতন আমাদেরও হইতেছে, কিন্তু শ্রী নাই বলিয়া অমন উত্থান-পরিণামী পতন হইতেছে না। এই শ্রী ধাকা-রূপ সীতারামের অদৃষ্ট বা দুরদৃষ্ট বশতঃই সীতারামের পতন ও উত্থান ঘটিল। ইহাতে শ্রীর কোন অপরাধ ছিল কি না, তাহা শ্রীচরিত্র সমালোচনা কালে বলিব। এখানে ইহাই বলি যে, এই জন্যই কি হিন্দুশাস্ত্রে স্বামী স্ত্রী পরস্পরের পাপ-পুণ্যের ভাগী বলিয়া থাকে? তা' বলিতে পারে। যখন একের কার্য্যের ফল অত এতদূর বর্ত্তিয়া থাকে, বর্ত্তিতে পারে, তখন এ কথা বলিলে প্রলাপ বলা হয় না। শ্রীর ন্যায় সহধর্ম্মিণী না হইয়া যদি প্রফুল্লের মত সহধর্ম্মিণী হইত, রমার ন্যায় সহধর্ম্মিণী না হইয়া যদি শান্তির মত সহধর্ম্মিণী হইত, তবে এই সীতারাম রায় দ্বিতীয় জনক ঋষির ন্যায় গীতার আর একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে বিরাজ করিতে পারিতেন।

২। শ্রী।

এই শ্রীর চরিত্র বড়ই দুর্ব্বোধ্য। আমরা যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাই পাঠকবর্গকে বলিতেছি। সংশয় কিন্তু সম্যক্ বিদূরিত হয় নাই।

বঙ্কিম বাবুর এই শেষ তিন খানি উপন্যাসের প্রধান প্রধান কয়েকটি স্ত্রী-চরিত্র, যথা—শান্তি প্রফুল্ল, নিশা, শ্রী ও জয়ন্তী, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী উপন্যাসসমূহের স্ত্রীচরিত্র হইতে দুই এক বিষয়ে বড়ই স্বতন্ত্র প্রকৃতির। যদি সময় হয়, এ কথাটি একটু বিস্তৃত করিয়াই বলিবার ইচ্ছা রহিল। আপাততঃ অতি সংক্ষেপে তাঁহাদের একটিমাত্র বিশেষ পার্থক্যের কথা বলিতেছি।

শান্তি, প্রফুল্ল, শ্রী ও জয়ন্তী—ইহাদের শিক্ষা অতি উচ্চ অঙ্গের। এখন উচ্চ অঙ্গের শিক্ষায় সচরাচর যাহা প্রতিপাদন করে, আমি সেরূপ উচ্চ অঙ্গের শিক্ষার কথা বলিতেছি না। কাব্য, সাহিত্য,

গণিত, অলঙ্কার এ শিক্ষার বিষয় নহে—ঘরকন্না ও দাম্পত্য প্রেমও এ শিক্ষার লক্ষ্য নহে। এ শিক্ষার লক্ষ্য অতি উচ্চ—এ শিক্ষার বিষয় অতি মহান। হিন্দুগণ, শুধু হিন্দুগণই বলিয়াই বা সঙ্কীর্ণতার পরিচয় কেন দিব—সকল ধর্ম্মাবলম্বিগণই যে শিক্ষাকে চরম শিক্ষা বলিয়া থাকেন, এই সকল স্ত্রীচরিত্র সেই শিক্ষাতেই সুশিক্ষিতা। যে নির্ম্মল নিষ্কাম ধর্ম্ম ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র ভক্ত অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন—যাহার মত কি ঐহিক কি পারলৌকিক, কি বৈজ্ঞানিক কি অধ্যাত্মিক ধর্ম্ম ইহ জগতে কখন প্রকাশিত হয় নাই হইতেও পারে না, যে শিক্ষার লক্ষ্য ঈশ্বর প্রাপ্তি বা দুঃখ-নিবৃত্তি, বিষয় চিত্তশুদ্ধি, প্রফুল্ল, নিশা, শ্রী ও জয়ন্তীতে আমরা সেই শিক্ষারই পরিচয় পাইয়াছি। * তোমার সূর্য্যমুখীই বল, ভ্রমরই বল, এই সকল স্ত্রীচরিত্রের তুলনায় তাহারা অতি সামান্য রমণী। সহরে পাড়াগাঁয়ে যত প্রভেদ, সাগরে নদীতে যত প্রভেদ, পর্ব্বতে ও বালুস্তূপে যত প্রভেদ, ইহাদের মধ্যেও সেইরূপই বুঝি প্রভেদ লক্ষিত হয়। যাহা হউক, সে কথাটা এখন বিস্তার করিয়া বলিবার সময় নহে—এখন ইহার উল্লেখ মাত্রেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। এই উচ্চশিক্ষারই বিভিন্ন প্রকৃতি, অবস্থাধীন তাহার বিভিন্ন পরিণাম, এই উপন্যাসত্রয়ে বুঝান হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই তিনখানি উপন্যাস একই উপন্যাসের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র।

নিদাঘের নির্ম্মেঘ গগনে দিবাকরের যেমন প্রোজ্জ্বল ও নির্ম্মল জ্যোতিঃ, শরতের সুনীল আকাশে শশধরের যেমন শুভ্র ও শীতল রশ্মি, ইহাদিগের মধ্যে কয়েকটি স্ত্রীচরিত্রে ঠিক্ তেমনই প্রোজ্জ্বল, তেমনই নির্ম্মল, তেমনই মধুর, তেমনই শীতল ধর্ম্ম-জ্যোতিঃ বিকশিত দেখিয়া হৃদয় আহ্লাদে পরিপ্লুত হইয়া যায়। আবার মধ্যাহ্নের দিনাকরও যেমন মধ্যে মধ্যে মেঘমালায় আবৃত হইয়া ক্ষীণপ্রভ হইয়া যায়—পূর্ণিমার শশধরও যেমন কাল কাদম্বিনীর করাল ছায়ায় মধ্যে মধ্যে আচ্ছাদিত হয়—ইহাদের মধ্যে কাহারও চরিত্রে সেই অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাব তেমনই ঈষৎ তমসাচ্ছন্ন, কখন ভ্রান্তি-বিজড়িত, কখনও বা অজ্ঞান ছায়ায় আবৃত হইয়া, ধর্ম্মের সেই শুভ্রকৃষ্ণ দুই পৃষ্ঠই অতি সুন্দররূপে প্রদর্শন করিতেছে। জানি না, ধর্ম্মের এমন সূক্ষ্ম সমস্যা অন্য কোন জাতির উপন্যাসে এমন বিবৃত ও ব্যাখ্যাত আছে কি না—কিন্তু বলিতে ইচ্ছা হয় যে, এমন উপন্যাসের অবতারণ একমাত্র ভারতেই সম্ভবে—অন্যত্র নহে।

প্রকৃত জ্ঞানের পথ অতি জটিল, অতি দুর্গম হিন্দুশাস্ত্রকারগণ এই কথা বলিয়া থাকেন। কবি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শেষের উপন্যাস গুলিতে ইহা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। যেমন পাহাড়ে পর্ব্বতে অধিরোহণ করিতে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন, একটু অসাবধান হইলেই তাহাকে সুনীচে পতিত হইতে হয়, তেমনই ধর্ম্মের উচ্চ শিখরে অধিরোহণ করিতে বিশেষ সাবধানতার আবশ্যক—সামান্য সতর্কতার অভাবে তাহাকে অধঃপতিত হইতে হয়।

* শান্তিচরিত্রে যে শিক্ষা তত পরিস্ফুট না হইলেও, তাহার অস্তিত্ব বেশ অনুমান করা যায়।

তবে একটা প্রভেদ এই আছে যে, যে পাহাড় পর্ব্বত হইতে পতিত হয়, সে আর বোধ হয় ইহজন্মে তথায় উঠিতে পারে না—কিন্তু ধর্ম্মের শিখর হইতে কাহারও তেমন পতন হইলে, তাহার উত্থানও অবশ্যম্ভাবী। পাহাড়ে পর্ব্বতে উঠিতে গেলে, কেহ তাহাতে সাহায্য করে না—কিন্তু ধর্ম্ম-শিখরে উঠিতে গেলে, একজনের প্রখর দৃষ্টি তাহার উপর পড়িয়া থাকে। তিনি পতিত হইলেও ধর্ম্মশিখর-আরোহণেচ্ছুকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া দেন। ধর্ম্মের শিখরে ভ্রমণ করিতে অধিরোহণ ও অবরোহণ দুইই অনেক সময়ে তুল্য সাধ্য—সে কথা সীতারাম-চরিত্রে দেখান হইয়াছে।

প্রফুল্ল প্রভৃতি চরিত্রে এই শিখর-রোহণ যেমন সহজ ও বিপত্তিশূন্য দেখিয়াছি, আমাদের এখনকার বর্ণিতব্য শ্রীচরিত্রে তেমন অধিরোহণ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে উত্থানপতন, অধিরোহণ অবরোহণ, জ্ঞান ও ভ্রান্তি তুল্যভাবেই আছে। এই অংশে শ্রীর চরিত্র আবার এই শ্রেণীস্থ অন্যান্য চরিত্রগুলি হইতে পৃথক্। আমরা এখন তাহাই দেখাইতেছি।

শ্রীর জীবনে তিনটি পরিষ্কার ছেদ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম ছেদে তাহার গৃহিণী-জীবন অতিবাহিত হইয়াছে। "গৃহিণী" কথাটা এখানে কিছু অপরিষ্কার বোধ হইতে পারে। তাহা হউক—তবু প্রথম ছেদের শ্রীকে গৃহিণীই বলা যায়। গ্রন্থকারের পরিচয় এইরূপ—"সংসারে গঙ্গারাম, গঙ্গারামের মা এবং শ্রী ভিন্ন কেহই ছিল না। গঙ্গারামের মা ইদানীং অতিশয় রুগ্ন হইয়াছিলেন, সুতরাং শ্রীই ঘরের গৃহিণী ছিল। শ্রী সধবা বটে, কিন্তু অদৃষ্টক্রমে স্বামিসহবাসে বঞ্চিতা।"

গ্রন্থমধ্যে শ্রীর সর্ব্বপ্রথম কার্য্য আমাদিগকে গ্রন্থকার এইরূপ দেখাইয়াছেন—

"ঘরে একটি শালগ্রাম ছিল,—এতটুকু ক্ষুদ্র একখানি নৈবেদ্য দিয়া প্রত্যহ তাহার একটু পূজা হইত। শ্রী ও শ্রীর মা জানিত যে, ইনিই সাক্ষাৎ নারায়ণ। * শ্রী চুল জড়াইয়া সেই শালগ্রামের ঘরের দ্বারের বাহিরে থাকিয়া মনে মনে অসংখ্য প্রণাম করিল। পরে হাত যোড় করিয়া বলিতে লাগিল, 'হে নারায়ণ, হে পরমেশ্বর! হে দীনবন্ধু! হে অনাথনাথ! আমি আজ যে দুঃসাহসের কাজ করিব, তুমি ইহাতে সহায় হইও। আমি স্ত্রীলোক—পাপিষ্ঠা জামা হইতে কি হইবে! তুমি দেখিও ঠাকুর।"

ধর্ম্মপ্রাণা শ্রীর ইহা অপূর্ব্ব আরম্ভ বটে।

ইহার পরে শ্রী স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। প্রণয়ভিখারী ভাবে নহে—স্বামি-সহবাসে বঞ্চিতা বলিয়া স্বামি-সহবাস লাভেচ্ছায় নহে—স্বামীকে সেই সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিবার জন্যও নহে—ভ্রাতার জীবন উদ্ধারের জন্য। সেই ভ্রাতা শ্রীর অত্যন্ত প্রিয়—সহোদর কোন্ সহোদরের অপ্রিয়ই বা হয়, শ্রীর ত তাহাতে আবার সেই সহোদরের আশ্রয়েই বাস। শ্রী ও সীতারামের সেই কথোপ-

* বৃহদক্ষরে মুদ্রিত কথাগুলি সর্ব্বত্রই আমরা এইভাবে মুদ্রিত করিয়াছি।

কথন পাঠকবর্গ একবার স্মরণ কর। তাহাতে একটা অতি সুন্দর কথা আছে। সীতারাম যখন বলিলেন—"উপায় আছে। তোমার ভাইকে বাঁচাইতে পারি। কিন্তু আমি মরিব।" শ্রী বলিলেন—"দেখ দেবতা আছেন, ধর্ম্ম আছেন, নারায়ণ আছেন। কিছুই মিথ্যা নয়। তুমি দীন দুঃখীকে বাঁচাইলে তোমার কখনও অমঙ্গল হইবে না। হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে ?"

ইহা পড়িয়া পাঠক কি মনে করিতেছ ? শ্রী সীতারামের সহবাসে বঞ্চিতা বলিয়া তৎপ্রতি সমধিক আসক্তি-শূন্য—ভ্রাতার প্রতি বেশী স্নেহশালিনী, ইহাই কি তোমার মনে হইতেছে ? না, শ্রী ধর্ম্মপ্রতি এতই আস্থাবতী যে, সীতারামের ঐরূপ ধর্ম্মজনক কার্য্যে তাহার অমঙ্গলের সম্ভাবনা শ্রী কিছুই মনে করিতেছে না, ইহাই ভাবিতেছ ? যাহাই ভাবিয়া থাক, কথাগুলি মনে রাখিও—গ্রন্থকারের কোন চরিত্রের প্রথম পরিচয় ভুলিবার সামগ্রী নহে।

ইহার পরে শ্রীকে দেখিলাম—সেই কবর-ক্ষেত্রে। এখানে শ্রী যাহা করিয়াছিল, তাহার ফল সীতারাম-চরিত্রে দেখিতে পাইয়াছ, এখানে সে কথা সম্বন্ধে কিছু বলিব না।

শ্রীর জীবন-নাটকের প্রথম ভাগের বিশেষ বর্ণিতব্য বিষয়—তাহার পতিপ্রেম। আমরা এখন সেই সম্বন্ধেই কিছু বলিব।

সূর্য্যমুখী, ভ্রমর, কমলমণি, দলনী প্রভৃতির পতিপ্রেমের যেখানে বিকাশ—এই শ্রীর পতিপ্রেম সেইখানেই আরম্ভ। কথাটা পরিষ্কার হইল না। আমি বলিতেছিলাম এই যে, ঘটনার পর ঘটনা আনিয়া এই সকল স্ত্রীচরিত্রে পতিপ্রেমের যে বিকাশ গ্রন্থকার পূর্ব্ববর্ত্তী উপন্যাসে দেখাইয়াছেন—শ্রীর পতিপ্রেমের আরম্ভেই পতিপ্রেমের সেই বিকশিত অবস্থা প্রত্যক্ষ হয়। আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। সূর্য্যমুখী প্রভৃতির বিকশিত পতিপ্রেমের উচ্চতর স্তর এই শ্রীর পতিপ্রেমের প্রথমেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

আমরা অন্যত্র বলিয়াছি, কোন বলের বিরুদ্ধ বল উপস্থিত হইলেই তাহার পরিমাণ হইতে পারে। প্রণয়েরও সেইরূপ। কাহার পতিপ্রেম কত বড়—বুঝিতে হইলে, কাহার পতিপ্রেমবিরোধী অবস্থা কত বেশী, তাহা দেখিতে হইবে। নগেন্দ্রনাথের সূর্য্যমুখীকে পরিত্যাগ, কুন্দকে গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্য সূর্য্যমুখীর পতিপ্রেম বিরোধী—সূর্য্যমুখীর পতিপ্রেম যে বিরোধে জয় লাভ করিল, তাই সূর্য্যমুখীর পতিপ্রেমের একটা পরিমাণ আমরা বুঝিলাম। শ্রীর পতিপ্রেমেও এই প্রকার বিরুদ্ধ বল দ্বারা নির্ণীত হইতে পারে। সেই বিরুদ্ধ বল অতি প্রবল। সূর্য্যমুখীর প্রণয়ের বিরুদ্ধে যে বল ছিল, শ্রীর প্রণয়ের বিরুদ্ধে তাহা ত প্রথমে ছিলই তাহাপেক্ষা লক্ষ লক্ষ গুণ বেশী বলও ছিল। সেই কথা এখন বলিতেছি।

প্রথমে দেখ—সীতারাম বিবাহ করিয়াও বিনা দোষে শ্রীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বা গ্রহণ করেন নাই। সেই যে একটা জ্যোতিষের কথা ছিল, তাহাও শ্রী

কিন্তু প্রথমে জানিত না। তার পরে, শুধু গ্রহণ করেন নাই, এমনও নহে; শ্রীকে বাস্তবিক বড়লোকের পত্নী হইয়াও সামান্য অন্নাচ্ছাদনেও যেন কষ্ট পাইতে হইত, এরূপ ইঙ্গিত গ্রন্থে দেখিতে পাই। এ সকলই শ্রীর বিনা দোষে! সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রনাথ-কুন্দ সম্বন্ধীয় প্রণয়ে বিরোধী ছিলেন বা হইতে পারেন এইরূপ একটা ভাব পোষণ করিয়া, নগেন্দ্রনাথ সূর্য্য-মুখীকে কিছু কষ্ট দিয়াছিলেন—ভ্রমর বিনা কারণে গোবিন্দলালকে সন্দেহ করিয়াছিল বলিয়া, তাঁহার হৃদয়ের ঘাত প্রতিঘাত বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার ইন্দ্রিয়-দমনের এত চেষ্টা ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে সন্দেহ করিয়াছিল বলিয়া, তাঁহাকে সময়ে অস-ময়ে কর্কশ বাক্য দ্বারা তাড়না করিত বলিয়া, গোবিন্দলাল ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া-ছিলেন—কিন্তু শ্রীর কোনই দোষ ছিল না—তবু তাহাকে সীতারাম গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু দেখ সেই শ্রীর পতিপ্রেম—

"জয়ন্তী। ইহার এক উপায় আছে—আর কিছুতে মন দাও।

শ্রী। কিসে মন দিব?

জয়ন্তী। এত বড় জগৎ—কিছুই কি মন দিবার নাই?

শ্রী। পাপে?

জয়ন্তী। না। পুণ্যে।

শ্রী। স্ত্রীলোকের পুণ্য একমাত্র স্বামি-সেবা। যখন তাই ছাড়িয়া আসিয়াছি—তখন আমার আবার পুণ্য কি আছে?"

জয়ন্তী। স্বামীর একজন স্বামী আছেন।

শ্রী। তিনি স্বামীর স্বামী—আমার নন। আমার স্বামীই আমার স্বামী—আর কেহ নহে।

জয়ন্তী। যিনি তোমার স্বামীর স্বামী তিনি তোমারও স্বামী—কেননা তিনি সকলের স্বামী।

শ্রী। আমি ঈশ্বরও জানি না—স্বামীই জানি।

জয়ন্তী। জানিবে? জানিলে এত দুঃখ থাকিবে না।

শ্রী। না, স্বামী ছাড়িয়া আমি ঈশ্বরও চাহি না। আমার স্বামীকে আমি ত্যাগ করিয়াছি বলিয়া আমার যে দুঃখ, আর ঈশ্বর পাইলে আমার যে সুখ, ইহার মধ্যে আমার স্বামিবিরহ দুঃখ আমি ভালবাসি।

জয়ন্তী। যদি এত ভাল বাসিয়াছিলে, তবে ত্যাগ করিলে কেন?

শ্রী। আমার কোষ্ঠীর ফল শুনিলে না? কোষ্ঠির ফল শুনিয়াছিলাম।

জয়ন্তী। এত ভাল বাসিয়াছিলে কিসে?

শ্রী তখন সংক্ষেপে আপনার পূর্ব্ববিবরণ সকল বলিল। শুনিয়া জয়ন্তীর চক্ষু একটু ছল ছল করিল। জয়ন্তী বলিল—

'তোমার সঙ্গে তাঁর ত দেখা সাক্ষাৎ নাই বলিলে হয়—এত ভাল বাসিলে কিসে?

শ্রী। তুমি ঈশ্বর ভালবাস—কয় দিন ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে?

জয়ন্তী। আমি ঈশ্বরকে রাত্রি দিন মনে মনে ভাবি।

শ্রী। যে দিন বালিকা বয়সে তিনি আমায় ত্যাগ করিয়াছিলেন, সে দিন

হইতে আমিও তাঁহাকে রাত্রিদিন ভাবিয়াছিলাম।

জয়ন্তী শুনিয়া রোমাঞ্চকলেবর হইয়া উঠিল। শ্রী বলিতে লাগিল, 'যদি একত্রে ঘর সংসার করিতাম, তাহা হইলে বুঝি এমনটা ঘটিত না। মানুষ মাত্রেরই দোষ-গুণ আছে। তাঁরও দোস থাকিতে পারে। না থাকিলেও আমার দোষে আমি তাঁর দোষ দেখিতাম। কখন না কখন, কথান্তর, মন ভার, অকুশল ঘটিত। তা হইলে, এ আগুন এত জ্বলিত না। কেবল মনে মনে দেবতা গড়িয়া তাঁকে আমি এত বৎসর পূজা করিয়াছি। চন্দন ঘষিয়া, দিয়ালে মাখাইয়া লেপন করিয়া মনে করিয়াছি, তাঁর অঙ্গে মাখাইলাম। বাগানে বাগানে ফুল চুরি করিয়া তুলিয়া, দিন ভোর কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া অনেক পরিশ্রমে মনের মত মালা গাঁথিয়া, ফুলময় গাছের ডালে ঝুলাইয়া মনে করিয়াছি, তাঁর গলায় দিলাম। অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া ভাল খাবার সামগ্রী কিনিয়া পরিপাটি করিয়া রন্ধন করিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়া মনে করিয়াছি, তাঁকে খাইতে দিলাম। ঠাকুর প্রণাম করিতে গিয়া কখন মনে হয় নাই যে, ঠাকুর প্রণাম করিতেছি—মাথার কাছে তাঁরই পাদপদ্ম দেখিয়াছি। তার পর জয়ন্তী—তাঁকে ছাড়িয়া আসিয়াছি। তিনি ডাকিলেন, তবু ছাড়িয়া আসিয়াছি!'

শ্রী আর কথা কহিতে পারিল না। মুখে অঞ্চল চাপিয়া, প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল।"

দেখ এই পতিপ্রেমের প্রাবল্য! জয়ন্তী এই পতিপ্রেমের বিরুদ্ধে কত বড় প্রেম ধরিলেন—শ্রী কিন্তু এখন তাঁহাতে ভ্রূক্ষেপও করিল না। ইহাতেই বুঝিতে পার, শ্রীর পতিপ্রেমের প্রাবল্য প্রথমাবস্থায়ই কিরূপ ছিল। এই প্রেমই প্রকৃত বিশুদ্ধ পতিপ্রেম। পতির রূপ গুণ হইতে এ প্রেমের উৎপত্তি হয় নাই, পতির রূপ-গুণের অভাবে এ প্রেম বিনষ্টও হইতে পারে না। এ প্রেম কর্ত্তব্যবুদ্ধি হইতে উদ্ভূত—হিন্দু শাস্ত্রে বা সামাজিক নিয়মানুযায়ী স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য বুদ্ধি হইতেই সঞ্জাত।

সীতারামের যে খণ্ডে শ্রী এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার আরম্ভে লিখিত আছে———

প্রথমখণ্ড।

—**—

দিবা।

গৃহিণী।

শ্রীর জীবনের দ্বিতীয়চ্ছেদ আমরা এই রূপ দেখিলাম,—

শ্রী সীতারামকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, কারণ তাঁহার কোষ্ঠিতে আছে যে তিনি 'প্রিয়প্রাণহন্ত্রী' হইবেন। স্বামীই স্ত্রীর প্রিয়—সুতরাং শ্রী হইতে সীতারামের প্রাণের আশঙ্কা আছে। যখন শ্রী সীতারাম কর্ত্তৃক পরিত্যক্তাবস্থায় ছিলেন, তখনও শ্রী গৃহিণী ছিলেন—তখনও তাঁহার মনে আশা ছিল, একদিন স্বামী গ্রহণ করিলেও করিতে পারেন—কিন্তু এখন আর সে আশা নাই—এখন শ্রীর আর কোন আশাই নাই।

সংসারে যাহার সুখের আশা-বিলুপ্ত হয়, একবার সন্ন্যাসের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি-

পাত তাহার সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণীয় বা সংসার-ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, এরূপ কোন ধারণা তাহার না থাকিতেও পারে, তবু সে সন্ন্যাসের দিকে ধাবিত হয়। যেমন সংসার-যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট হতভাগ্য দুই একটি মানব পরলোকে কি হইবে না হইবে, তাহা ক্ষণমাত্র চিন্তা না করিয়াও আত্মহত্যা দ্বারা ইহলোকের ব্যাপার শেষ করিয়া ফেলে—তেমনিই সন্ন্যাসে কি আছে না আছে তাহা না জানিয়াই অনেক সংসারসুখে নিরাশ ব্যক্তি সন্ন্যাসের দিকেই ধাবিত হইয়া থাকেন। উপস্থিত অবস্থা কষ্টদায়ক, তাই তাহা ত্যজ্য, ইহাই এইরূপ ত্যাগের প্রথম কারণ। শ্রীরও তাহাই ঘটিল। শ্রী ঊর্দ্ধশ্বাসেই যেন সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন—যে সংসারে থাকিলে তৎকর্ত্তৃক সীতারামের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, যে সংসারে স্বামি-সহবাস-সুখ হইতে চিরদিন তরে বঞ্চিত হইতে হইবে—সে সংসারে শ্রী থাকিবেনই বা কেন?

শ্রী সংসার ত্যাগ করিয়া, সীতারামকে ত্যাগ করিয়া আসিলেন। পথে অদৃষ্টবশতঃ তাঁহার জয়ন্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। জয়ন্তী শ্রীর সমবয়স্কা, কাজেই উভয়ের মধ্যে অল্পেই প্রণয় জন্মিল। জয়ন্তী সন্ন্যাসিনী—তিনি সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে ত্যাগ করিয়া নিষ্কাম ব্রতাবলম্বন করিয়াছেন। সেই জয়ন্তী এখন শ্রীর দুঃখনিবারণে সচেষ্ট হইলেন। এই জয়ন্তীর শিক্ষাই শ্রীর ঔপন্যাসিকের দ্বিতীয়াঙ্কের প্রধান বর্ণিতব্য বিষয়। আমরা এখন তাহাই বলিব।

জয়ন্তী শ্রীকে কি শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বৃত্তান্ত গ্রন্থে নাই। তবে সে শিক্ষার কি ফল ফলিয়াছিল, তাহা দেখিয়া সে শিক্ষার প্রকৃতি বুঝা যাইতে পারে। শ্রী চরিত্রোপরি সেই শিক্ষার ফল কিরূপ হইতেছিল, তাহা নিম্নের উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিলেই সহজে বুঝিতে পারা যাইবে।

"মহাপুরুষ কেবল জয়ন্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন—শ্রীর সঙ্গে নহে। জয়ন্তী এক হস্তীগুম্ফা মধ্যে প্রবেশ করিল,—শ্রী, ততক্ষণে বিরূপাতীরে বেড়াইতে লাগিল। পরে, শিখরদেশে আরোহণ করিয়া চন্দন বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া, নিম্নে ভূতলস্থ নদীতীরে এক তালবনের অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিতে লাগিল। পরে জয়ন্তী ফিরিয়া আসিল।

"মহাপুরুষ †ক আদেশ করিলেন, জয়ন্তীকে না জিজ্ঞাসা করিয়া, শ্রী বলিল—'কি মিষ্ট পাখীর শব্দ! কাণ ভরিয়া গেল!'

জয়ন্তী। স্বামীর কণ্ঠস্বরের তুল্য কি?

শ্রী। এই নদীর তরঙ্গের গদ্ গদ্ শব্দের তুল্য।

জয়ন্তী। স্বামীর কণ্ঠস্বরের তুল্য কি?

শ্রী। অনেক দিন, স্বামীর কণ্ঠ শুনি নাই—বড় আর মনে নাই।"

"জয়ন্তী বলিল—'এখন শুনিলে, তমন ভাল লাগিবে না কি?' শ্রী চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে, মুখ তুলিয়া জয়ন্তীর পানে চাহিয়া,

শ্রী জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন ঠাকুর কি আমাকে পতিসন্দর্শনে যাইতে অনুমতি করিয়াছেন?

জয়ন্তী। তোমাকে ত যাইতেই হইবে আমাকেও তোমার সঙ্গে যাইতে বলিয়াছেন।

শ্রী। কেন?

জয়ন্তী। তিনি বলেন, শুভ হইবে।

শ্রী। এখন আর আমার তাহাতে শুভাশুভ, সুখ দুঃখ কি ভগিনি?'

"জয়ন্তী। * * * তুমি যাইবে?

শ্রী। তাই ভাবিতেছি।

জয়ন্তী। ভাবিতেছ কেন? সেই পতিপ্রাণহন্ত্রী কথাটা মনে পড়িয়াছে বলিয়া কি?

শ্রী। না, এখন আর তাহাতে ভীত নই।

জয়ন্তী। কেন ভীত নও আমাকে বুঝাও। তা বুঝিয়া তোমার সঙ্গে যাওয়া আমি স্থির করিব।

শ্রী। কে কাকে মারে বহিন? মারিবার কর্তা একজন—যে মারিবে, তিনি তাহাকে মারিয়া রাখিয়াছেন। সকলেই মরে, আমার হাতে হউক, পরের হাতে হউক, তিনি একদিন মৃত্যুকে পাইবেন। আমি কখন ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে হত্যা করিব না, ইহা বলাই বাহুল্য; তবে যিনি সর্ব্বকর্ত্তা, তিনি যদি ঠিক করিয়া থাকেন, আমারই হইতে তাঁহার সংসার যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি ঘটিবে, তবে কাহার সাধ্য অন্যথা করে! আমি বনে বনেই বেড়াই, আর সমুদ্র পারেই যাই, তাঁহার আজ্ঞার বশীভূত হইতেই হইবে। আপনি সাবধান হইয়া ধর্ম্মমত আচরণ করিব—তাহাতে তাঁহার বিপদ্ ঘটে, আমার তাহাতে সুখ দুঃখ কিছুই নাই।"

"জয়ন্তী জিজ্ঞাসা করিল, 'তবে ভাবিতেছ কেন?'

শ্রী। ভাবিতেছি, গেলে যদি তিনি আর না ছাড়িয়া দেন?

জয়ন্তী। যদি কোষ্ঠী ভয় আর নাই, তবে ছাড়িয়া নাই দিলেন? তুমিই আসিবে কেন?

শ্রী। আমি কি আর রাজার বামে বসিবার যোগ্য?

জয়ন্তী। এক হাজার বার। যখন তোমাকে সুবর্ণরেখার ধারে কি বৈতরণী-তীরে প্রথম দেখিয়াছিলাম, তাহার অপেক্ষা তোমার রূপ কতগুণে বাড়িয়াছে তাহা তুমি কিছুই জান না

শ্রী। ছি!

জয়ন্তী। গুণ কত গুণে বাড়িয়াছে তাও কি জান না? কোন্ রাজমহিষী গুণে তোমার তুল্যা?

শ্রী। আমার কথা বুঝিলে কই? কই, তোমার আমার মনের মধ্যে বাঁধা রাস্তা বাঁধিয়াছ কই? আমি কি তাহা বলিতেছিলাম? বলিতেছিলাম যে, যে শ্রীকে ফিরাইবার জন্য তিনি ডাকাডাকি করিয়াছিলেন, সে শ্রী আর নাই—তোমার হাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এখন আছে কেবল তোমার শিষ্যা। তোমার শিষ্যাকে নিয়া মহারাজাধিরাজ সীতারাম রায় সুখী হইবেন? না তোমার শিষ্যাই মহারাজাধিরাজ হইয়া সুখী হইবে? রাজরাণীগিরি চাকরি তোমার শিষ্যার যোগ্য নহে।

জয়ন্তী। আমার শিষ্যার আবার সুখ

দুঃখ কি? (পরে সহাস্যে) ধিক্ এমন শিষ্যায়!

শ্রী। আমার সুখ দুঃখ নাই, কিন্তু তাঁহার আছে। যখন দেখিবেন, তাঁহার শ্রী মরিয়া গিয়াছে, তাহার দেহ লইয়া একজন সন্ন্যাসিনী প্রবঞ্চনা করিয়া বেড়াইতেছেন, তখন কি তাঁর দুঃখ হইবে না?"

ইহাতে আমরা দেখিলাম—দুইটি বিরুদ্ধ বলের অপূর্ব্ব সংঘর্ষণ। শ্রীর পতি-প্রেম কিরূপ ছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি—এখন জয়ন্তীর শিক্ষায় শ্রীর ভগবৎ প্রেম বা দিব্যজ্ঞান কিরূপ জন্মিতেছিল তাহাও দেখিতে পাইলাম। দুইই প্রায় তুল্য—কিন্তু শ্রীর অদৃষ্ট-দোষে দুইই পরস্পর বিরোধী। সংসারী, পতিব্রতা শ্রী একবার মনে করিতেছিল—স্ত্রীর পতিই গতি, পতিই ঈশ্বর—পতিদেবের সুখ-বিধানই স্ত্রীর একমাত্র কার্য্য; আবার জয়ন্তীর শিষ্যা সন্ন্যাসিনী শ্রী ভাবিতেছিল—পতিরও একজন পতি আছেন, তিনি পতি হইতেও বড়, পতির সুখই বা কি—সুখমাত্রই পরিত্যাগ করিতে হইবে—সুখ দুঃখ উভয়ই পরিবর্জ্জন করিয়া একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইবে। এই দুই "শ্রী"র অপূর্ব্ব সমাবেশ এই অপূর্ব্ব কথোপকথনে আছে, এই কথোপকথন কালে শ্রী ভিতরে জয়ন্তী কিন্তু ভিতরেরও অতি ভিতরে সেই শ্রী—ভিতরে সন্ন্যাসিনী, কিন্তু ভিতরেরও অতি ভিতরে সেই পতিপ্রাণা রমণী—ভিতরে জ্ঞান, কিন্তু ভিতরেরও অতি ভিতরে ভক্তি। তখন শ্রীর একদিকে দিবা—অন্যদিকে নিশা; জয়ন্তীর শ্রী পাপীর সুমিষ্ট স্বরে, প্রকৃতির মধুর সঙ্গীত শুনিতেছিল—স্বামীর কণ্ঠস্বরও সেই সময়ে সেই শব্দের সহিত তুলনীয় মনে হইল না—মনে হইল, সেই বিহগের আরাব, সেই শিখরতলস্থ বহমান নদীর তর তর গদ্ গদ্ শব্দেরই তুল্য; জয়ন্তীর শ্রী বলিতেছিল—"অনেক দিন স্বামীর কণ্ঠ শুনি নাই—বড় আর মনে নাই।" জয়ন্তীর শ্রী বলিতেছিল, এখন আর তাহার পতিসন্দর্শনে শুভাশুভ সুখ দুঃখ নাই; জয়ন্তীর শ্রী বলিতেছিল "কে কারে কারে বহিল?···কিছুই না।" আবার শ্রীর শ্রী—সীতারামের শ্রী বলিতেছিল—"আমার সুখ দুঃখ নাই···দুঃখ হইবে না?" এই শ্রীর নিকট জয়ন্তী জিজ্ঞাসা করিল, 'এখন শুনিলে তেমন ভাল লাগিবে না কি?' "শ্রী চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে, মুখ তুলিয়া জয়ন্তীর পানে চাহিয়া, শ্রী জিজ্ঞাসা করিল 'কেন ঠাকুর কি আমাকে পতি সন্দর্শনে যাইতে অনুমতি করিয়াছেন?' শ্রীর পক্ষে বড়ই ভয়ানক এই শিক্ষা ব্যাপার—এই শিক্ষার ফলে শ্রীকে দুইদিক্ হইতে দুইটি প্রবল বল প্রবল বলে আকর্ষণ করিতেছিল; এক দিকে সীতারাম ও সংসার—অপর দিকে জয়ন্তী ও সন্ন্যাস। এই টানাটানিতে বুঝি শ্রী শ্রীহীন হইয়া পড়িল, এই টানাটানিতেই বুঝি শ্রীর সর্ব্বনাশ ঘটিল।

এই টানানিটা আমরা একদিন ভ্রমরচরিত্রেও দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা এত স্পষ্ট নহে; তাহা কিছু কাব্যের ঘনঘটায় বেশী আচ্ছাদিত। কিন্তু শ্রীর এই টানাটানিটা বড়ই পরিষ্কার। একদিকে সংসার—অন্যদিকে সন্ন্যাস—একদিকে পতি,

অন্তদিকে ভগবান্, একদিকে সীতারাম অন্তদিকে জয়ন্তী। টানাটানি করিয়া শ্রীকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলিয়াছিল। এমন কি, এমনই করিয়াছিল যে, শ্রী ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে; আছে কেবলমাত্র জয়ন্তীর শিষ্যা; এই টানাটানির ফলই "শ্রী" উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে।

এখন পাঠক ভাবিয়া দেখ—বঙ্কিম বাবুর এই উপন্যাস তিনখানি কোন্ শ্রেণীর উপন্যাস। পতিপ্রেমের আদর্শ নির্ম্মাণ শেষ করিয়া, এখন কবি উচ্চতর স্তরে অধিরোহণ করিতেছেন। এখন তিনি দেখাইতেছেন—সেই পতির পতিপ্রেম—ভগবদ্ভক্তি—নির্ম্মল জ্ঞান। এখন সংসারে যাহা আছে, তাহা লইয়াই ত এইরূপ শ্রেষ্ঠ কবি বসিয়া থাকেন না; তাঁহার মহীয়সী কল্পনা বর্ত্তমান ছাড়িয়া, ভবিষ্যতের অনেক দূর ভেদ করিয়া থাকে। পতিপূজাই স্ত্রীর একমাত্র পূজা—পতিসেবাই স্ত্রীর একমাত্র ধর্ম্ম—এই কথা সাধারণ রমণীকে সহজে বুঝাইতে পারা যায়। কিন্তু রমণীর শিক্ষা যখন উচ্চতর হইবে—যখন এই পতির পতিকে তাহারা সাক্ষাৎ ভাবে দেখিতে চাহিবে, তখন তাহাদের কি হইবে—তাহাই প্রদর্শন করিতে এই সকল স্ত্রীচরিত্রের অবতারণা। সাধারণ শিক্ষিতা রমণীগণ সীতা, সাবিত্রী, সূর্য্যমুখী, কমলমণিকে সহজেই আদর্শ মনে করিতে পারে, কিন্তু জয়ন্তীর ন্যায় শিক্ষিতা, প্রফুল্লের ন্যায় শিক্ষিতা, শ্রীর ন্যায় শিক্ষিতা রমণী অত সহজে তাহা পারে না। তাঁহাদের চিত্তে উচ্চ শিক্ষার জন্য যে একটা ভাব উপস্থিত হয়, সেই ভাবের বিচিত্র লীলা এই সকল উপন্যাসে বিবৃত হইয়াছে। এমন গভীর তত্ত্ব—জগতে কোন জাতির উপন্যাসে স্থান পাইয়াছে কি না জানি না। জ্ঞানবতী রমণীর নিকটে একদিকে পতি, অন্যদিকে সেই পতিরও পতি; একদিকে সুখ ও সংসার, অন্যদিকে সুখ-দুঃখবিরহিত সংসার বা সন্ন্যাস স্থাপন করিয়া কবি কি অপূর্ব্ব দৃশ্যই প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার মত ভাল না মন্দ, সে কথা আমরা বলিতে চাহি না, কিন্তু সেই মত সমর্থনার্থ তাঁহার কি অপূর্ব্ব কাব্য-কৌশল তাহাই আমরা বলিতে চাহি। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ পতিকে স্ত্রীর নিকটে ভগবানের তুল্য বলিয়া বিবেচনা করিতে বলিয়াছেন। এরূপ উপদেশের তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝিতে পারি, এমন শক্তি আমাদের নাই। তবে আমরা ইহাই বলিতে পারি যে, যে দেশে গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ

গুরুরেব পরংব্রহ্ম—

বলিয়া কথিত হয়, এ উপদেশ সেই দেশেরই বটে। এ সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মত আমরা অন্যত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। বেশী লিখিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না। যাহা না বলিলে নয়, তাহাই সংক্ষেপে বলিলাম।

জ্ঞানে ভক্তিতে—দিবায় রজনীতে এই টানাটানির ফলে, শ্রীর জীবনে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল—শ্রী জীবনের সেই সায়ংকালে জয়ন্তীর সঙ্গে নিম্নলিখিত কথোপকথন করিলেন।

"জয়ন্তী বলিল, 'শ্রী আর দেখ কি? এক্ষণে স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর।'

শ্রী। সেই জন্যই কি আসিয়াছি।

জয়ন্তী। যত প্রকার মনুষ্য আছে, রাজর্ষিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রাজাকে রাজর্ষি কর না কেন।

শ্রী। আমার কি সাধ্য ?

জয়ন্তী। আমি বুঝি যে, তোমা হইতেই এই মহৎকার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। অতএব যাও, শীঘ্র গিয়া রাজা সীতারামকে প্রণাম কর ?

শ্রী। জয়ন্তি! সোলা জলে ভাসে বটে, কিন্তু বাটো দড়িতে পাথরে বাঁধিয়া দিলে সোলাও ডুবিয়া যায়। আবার কি ডুবিয়া মরিব ?

জয়ন্তী। কৌশল জানিলে মরিতে হয় না। ডুবুরিয়া সমুদ্রে ডুব দেয়—কিন্তু মরে না। রত্ন তুলিয়া আনে।

শ্রী। আমার সে সাধ্য আছে, আমার এমন ভরসা হইতেছে না। অতএব এক্ষণে আমি রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব না। কিছুদিন না হয় এইখানেই থাকিয়া আপনার মন বুঝিয়া দেখি, যদি দেখি আমার চিত্ত এখন অবশ, তবে সাক্ষাৎ না করিয়াই এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাইব, স্থির করিয়াছি।

অতএব শ্রী, রাজাকে সহসা দর্শন দিল না।”

শ্রীর এই ইতস্তত: ভাবই তাহার জীবনের সন্ধ্যা—জয়ন্তীই এই সন্ধ্যার কারণ (যেমন শ্রী সম্বন্ধে গ্রন্থের এই খণ্ড-গুলির নামের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা গেল—সীতারাম সম্বন্ধে ঠিক সেই রূপ ব্যাখ্যা করা যায়। ফলতঃ সীতারামের সুখ দুঃখ এক প্রকার শ্রীর কার্য্য দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ছিল। এ কথা আমরা সীতারাম-চরিত্র ব্যাখ্যাস্থলে এক প্রকার বলিয়াছি—কিন্তু গ্রন্থের এই খণ্ডগুলির নামের ব্যাখ্যা তাহাতে লিখিত হয় নাই।)

—তাই সীতারামের দ্বিতীয় খণ্ডের আরম্ভে লিখিত আছে—

দ্বিতীয় খণ্ড।

—**—

সন্ধ্যা।

জয়ন্তী।

এখন শ্রীর জীবনের তৃতীয় ছেদের কথা বলিব।

জয়ন্তীর শিক্ষার ফলে, শ্রীর পরিণাম কি ঘটিয়াছিল, এই অধ্যায়ে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ছেদে যে ফলের আরম্ভ দেখিয়াছিলাম, এই ছেদে সেই ফলের উপসংহার দেখিলাম।

যোদ্ধার যেমন রণশিক্ষা, এই দ্বিতীয় ছেদেও সেইরূপ শ্রীর জ্ঞানশিক্ষা; যোদ্ধার যেমন রণক্ষেত্র—এই তৃতীয় ছেদও সেই-রূপ শ্রীর কার্য্যক্ষেত্র। এ পর্য্যন্ত যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে শ্রী ও প্রফুল্লে বিশেষ প্রভেদ দেখিতে পাই নাই—এখন যাহা দেখিব, তাহাতেই শ্রী ও প্রফুল্লের প্রভেদ দেখিতে পাইব।

প্রফুল্ল বাহিরে অমন উচ্চ অঙ্গের জ্ঞানশিক্ষা করিয়াও—স্বামী ব্রজেশ্বরের গৃহধর্ম্মেই আপনাকে নিয়োজিত করিলেন। শ্রী কিন্তু করিল তাহার বিপরীত। শ্রী সীতারামের মহিষী হইতে স্বীকৃত হইল না—শ্রী মনে করিল, মহিষী পদ এখন তাহার যোগ্য নহে—সে এখন